

515

বিজ্ঞান চেতনা



4241
4.6.88

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
BANIPUR

বিজ্ঞান চেতনা ৬

সম্পাদক

কুঞ্জবিহারী পাল

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
BANIPUR

মানুষের কথা

বিশ্বতোষ চট্টোপাধ্যায়

●

প্রত্নতত্ত্বের কথা

সন্তোষ বসু

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির

৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৭৩
মে, ১৯৬৬

প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলকাতা-১২

S.C.E R T., West Bengal
Date.. ... .
Acc. No...4241......

ছেপেছেন
শরৎচন্দ্র গুড়ে
নারায়ণী প্রেস
২৮/সি, কালিদাস সিংহ লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ এঁকেছেন
গণেশ বসু

৪.০০

22715

সৃষ্টির সেই আদিম যুগের অবস্থাটা ভাবলে আজও অবাক হতে হয়। তখন মানুষ ছিল, যাকে বলে একেবারেই অসহায়, সহায়সম্বলহীন। তার দেহে না ছিল কোন আচ্ছাদন, ক্ষুধা মেটাবার জন্যে হাতের কাছে না ছিল কোন খাদ্য, আর নিজের রক্ষার জন্যে না ছিল একটু নিরাপদ আশ্রয়।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, মানুষ যতই অসহায় হোক না কেন, প্রকৃতির ভয়াল ভ্রূকুটিতে সে ভয় পায় নি। প্রকৃতির সেই বুক-কাঁপানো অবস্থার মধ্যেও মানুষ নিজেকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে চেষ্টা করেছে আপ্রাণ। প্রতিকূল পরিস্থিতির কাছে হার স্বীকার করেনি সে।

প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ে মানুষের এই যে জয়, এ সম্ভব হয়েছিল মানুষের ধারালো বুদ্ধি, অন্তরের জ্ঞান আর আশ্চর্য সৃজন-প্রতিভার জন্যেই।

সুতরাং প্রকৃতি-মানুষের সংগ্রামে মানুষের হাতেই আজ জয়-পতাকা। এই জয়-পতাকা বড় সহজে আসেনি। পদে পদে বাধা, ক্ষণে ক্ষণে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষ তার বুদ্ধি-বিবেচনা জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে, দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো দেবে।

এমনিভাবেই মানুষ নিজে জেনেছে প্রকৃতির রহস্যের কথা, সেই জ্ঞান ছড়িয়ে দিয়েছে সকল মানুষের মধ্যে। বিজ্ঞানের নবজন্ম তো এইভাবেই সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞানের জন্মলগ্নে প্রয়োজনের তাগিদ থাকিলেও, মানুষ শুধু যে প্রয়োজনের দাস—এ কথা ভাবলে ভুল হবে। প্রয়োজনের সীমানা ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে সে এগিয়েছে অপ্রয়োজনের সীমাহীন উদার ক্ষেত্রে। জানার আনন্দে, জানার কৌতূহলে তার অভিযানের বিরাম নেই। তাই বিজ্ঞানের যাত্রা অশ্রান্ত, বিজ্ঞানীর সাধনা অতন্দ্র। নতুন নতুন আবিষ্কারে, নব-নব উদ্ভাবনে বিজ্ঞান-সাধকের দল আজও অনলস। আজও শ্রান্তিক্লান্তিহীন।

এবং সেই কারণেই জলে-স্থলে-নভোদেশে বিজ্ঞান আজ এঁকে দিয়েছে তার পদচিহ্ন। দূরকে সে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে দৃশ্যমান। মানুষ আজ আর তাই অসহায় নয়, ভীত নয়। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা মানুষের সৃষ্টিশীল প্রতিভার দীপ্তিমান উদাহরণ। এক কথায়, মানুষ এগিয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে, সৃষ্টি থেকে নতুন সৃষ্টিতে।

এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান তাই এ যুগে অপরিহার্য। স্কুলে বিজ্ঞান অবশ্য-পাঠ্য বিষয় হিসেবে আজ স্বীকৃত।

STATE INSTITUTE OF EDUCATION

আজ ব্যক্তি এবং সমাজ-জীবনের পদে পদে বিজ্ঞানের এত বেশি প্রয়োগ রয়েছে যে, এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকার দরুন নিজেকে বড়ই অসহায় মনে হয়। যাঁরা বয়স্ক অথচ বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না তাঁদেরও যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানা চলবে না এমন কোন কথা নেই। বরং আমরা মনে করি, বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলক জ্ঞান একান্তই আবশ্যক ও সর্বজনীন হওয়া দরকার।

এ-সব উদ্দেশ্য নিয়েই 'বিজ্ঞান চেতনা'র প্রকাশ। 'বিজ্ঞান চেতনা'র ভাষা যতটা সম্ভব সহজ এবং সরল করার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ একেই তো বিজ্ঞানের তথ্যগুলি কঠিন বলে সাধারণের ধারণা, তার উপরে যদি ভাষা হয় কঠিন এবং আলঙ্কারিক তবে এ বিষয়ে আকর্ষণের চেয়ে বিকর্ষণের সম্ভাবনাই বেশি। অনেক জায়গায় বোঝবার সুবিধের জন্যে ছবির প্রয়োজন হয়েছে; সে ব্যাপারেও কোন কার্পণ্য করা হয় নি।

পরিভাষা সম্বন্ধে এইটুকু আমাদের বক্তব্য যে, পুস্তকগুলিতে যেমন কষ্টকল্পিত বাংলা পরিভাষার উপর জোর দেওয়া হয়নি, তেমনি যে-সব বৈজ্ঞানিক শব্দের সহজ, সুন্দর এবং সর্বজনস্বীকৃত বাংলা পরিভাষা চালু আছে তাও কোনক্রমে এড়িয়ে যাওয়া হয় নি।

এ পুস্তকগুলি সম্পাদনা করতে গিয়ে বহু সুযোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে নানাভাবে সহযোগিতা পেয়েছি। বিভিন্ন খণ্ডগুলি যাঁরা লিখেছেন তাঁরা সকলেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি। তা-ছাড়া লেখক হিসেরেও এঁদের পাঠক মহলে বিশেষ সুনাম আছে। এঁদের পূর্ণ সহযোগিতা না পেলে এ পুস্তকগুলির প্রকাশই সম্ভব হত না। এঁদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ-ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে 'বিজ্ঞান চেতনা'র বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে লাভবান হয়েছি। তাঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ করে উৎসাহী তরুণ সাহিত্যিক পলাশ মিত্রের নাম উল্লেখ করছি।

পরিশেষে এই বলে শেষ করি যে, 'বিজ্ঞান চেতনা' গল্পের বইয়ের মতই পাঠককে আকর্ষণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই সিরিজ পাঠে যদি পাঠকের বিজ্ঞান চর্চার ভিত্তি সুদৃঢ় হয় ও বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ জাগে তবেই এ আয়োজন সার্থক।

এক ইংরেজ লেখক বলেছেন—Man is the measure of things—আজকের ছুনিয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যতই উন্নতি হোক না কেন, সে সবের গোড়ায় কিন্তু এই মানুষ। এ পৃথিবীটা যদি মানুষ-শূন্য থাকত, যদি এখানে ঘুরে বেড়াত বন্য পশুকুল, তবে কি কোনদিন প্রয়োজন উঠত জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন কিছু সম্বন্ধে আলোচনার ?

প্রশ্ন জাগে, বর্তমানের এই যে মানুষ এরা কি চিরদিনই এরকমটি ছিল ? এদের পূর্বপুরুষ কারা ? কী রকম ছিল তারা দেখতে ? গরিলা, শিম্পাঞ্জি ও বানরের আচার ব্যবহারের সঙ্গে মানুষের কোন কোন জায়গায় মিল আছে না কি ? যদি থাকে তবে ওদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কী এবং কতখানি ? তা-ছাড়া বিভিন্ন দেশের মানুষ দেখতে কতই না আলাদা ! আফ্রিকার মানুষ আর চীন-জাপানের মানুষ আকার আকৃতিতে কতই না ভিন্ন ! এত সব বিভিন্ন-দেহধারী মানুষের পূর্বপুরুষরা কি একই মানবগোষ্ঠীর ? আজ আমরা কৃষির সাহায্যে খাদ্য উৎপাদন করি। আদিমকালের মানুষও কি এমনিভাবেই খাদ্য-সংগ্রহ করত ? কী রকম ছিল তাদের সমাজ-ব্যবস্থা ? এমনি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 'মানুষের কথা' অংশে। এই অংশটি লিখেছেন বিশ্বতোষ চট্টোপাধ্যায়, বি. এ. (অনার্স)।

'মানুষের কথা' অংশটি লিখবার ব্যাপারে অধ্যাপক কালাচাঁদ সাহা, এম. এস্-সি. অনুগ্রহ করে যে সাহায্য করেছেন তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

আজ আমরা জেনেছি, বেশ কয়েক লক্ষ বছর আগেই পৃথিবীর বুকে মানব-সভ্যতার শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেকালের কোন লিখিত ইতিহাস আমাদের কাছে নেই। কারণ লিপির আবিষ্কার পাঁচ-ছয় হাজার বছরের বেশি পুরোনো নয়। তাই যদি হয় তবে সেই অতি-প্রাচীন মানুষের জীবনধারা জানবার উপায় কী ? পুরাকালের নানা সভ্য জাতির কথা আজ আমরা জেনেছি। কিন্তু কী করে ? 'প্রত্নতত্ত্বের কথা, অংশে আমরা সেইসব কর্ম-কৌশলের কথাই বলেছি যে সবের সাহায্যে প্রত্নতাত্ত্বিক সেই আদিম যুগের নানা খবর আমাদের চোখের সামনে এনে হাজির করেন।

এই অংশটি লিখেছেন অধ্যাপক সন্তোষ বসু, এম. এ., ।

২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৩
কলকাতা

কুঞ্জবিহারী পাল

এই সিরিজে

প্রথম খণ্ড :	আকাশের কথা
	পৃথিবীর কথা
দ্বিতীয় খণ্ড :	গাছপালার কথা
	জীবজন্তুর কথা
তৃতীয় খণ্ড :	পদার্থ-বিজ্ঞানের কথা
	রসায়নের কথা
চতুর্থ খণ্ড :	শিল্প ও বিজ্ঞান
পঞ্চম খণ্ড :	মানব-দেহের কথা
	রোগ-জয়ের কথা
ষষ্ঠ খণ্ড :	মানুষের কথা
	প্রত্নতত্ত্বের কথা

সূচীপত্র

মানুষের কথা

প্রত্নতত্ত্বের কথা

মানুষের কথা

বিশ্বতোষ চট্টোপাধ্যায়

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
BANIPUR

১

গোড়ার কথা

হাওড়া স্টেশনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে দেখা যায় অসংখ্য মানুষের ভিড়। কত দেশ থেকেই না তারা আসছে আর কত দেশেই না যাচ্ছে! এক ঘণ্টার মধ্যেই হয়ত যে-সব গাড়ি পূর্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ থেকে যাত্রী বয়ে নিয়ে আসছে তাদের মধ্যে নজরে আসে আসামের খাসিয়া, নেপালের গুর্খা, বর্ধমানের সাঁওতাল, মধ্যপ্রদেশের ভীল, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী, আরও কত। আবার এই ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় ইউরোপ আমেরিকার অধিবাসীদের, চীনাদের, জাপানীদের, আবার কখনও আফ্রিকার আদিবাসীদের। এদের কেউ ধবধবে ফর্সা, কেউ মেটে রঙের, কেউ বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কারও মাথার চুল সোনালি, কারও কালো পাতলা, কারও ঘন ঠাসা আর কোঁকড়ানো।

দেখে দেখে আশ্চর্য লাগে। এরা সকলেই মানুষ, সকলেই মোটামুটি একই ধরনে হাঁটে চলে, সকলেই কথা বলে; সকলেরই নাক, মুখ, চোখ, হাত, পা-র গঠন দেখে মানুষ বলেই চেনা যায়—গরু, কুকুর বা বানর বলে ভুল হয় না।

অনেক সময় এমন মানুষও চোখে পড়ে যারা আমাদের মত কাপড় চোপড় পরে না বা যাদের চেহারার মধ্যে বিশৃঙ্খল, বন্য ভাব থাকায় আমরা মনে মনে সন্দেহ করি, এরা মানুষ তো? কোন্ দেশী মানুষ? নিশ্চয়ই জংলি। কিন্তু আমরা স্থিরভাবেই জানি যে এরা মানুষই—এরাও আমাদেরই মত চোখ-মুখ-নাক-বিশিষ্ট, এরাও চিন্তা করে, এরাও আমাদের মত ক্ষিধের খাবার জোগাড় করবার জন্যে পরিশ্রম করে, হতে পারে তা পাথর ছুঁড়ে হরিণ মারবার জন্যে, অথবা আদিম যুগের বর্শা দিয়ে মাছ ধরবার জন্যে, আর

না হলে গাছে ওঠে বুনো ফল পেড়ে আনবার জন্যে। বন্য জন্তু, শীত, গ্রীষ্ম, ঝড় ঝাপটা থেকে বাঁচবার জন্যে এরাও আমাদেরই মত আশ্রয় তৈরি করে নেয়, তা পাহাড়ের গুহাতেই হোক আর খড়কুটো ঘাস পাতা দিয়ে একটুকু বাসাই হোক।

প্রাণী-জগতে মানুষ

পৃথিবীতে যেখানে যত মানুষ আছে সকলেরই কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে যা দিয়ে তাদের অন্য প্রাণীদের থেকে আলাদা করা যায়, যে বৈশিষ্ট্য থাকার জন্যে তারা মানুষ বলে পরিচিত হয়। আবার প্রত্যেক দেশের বা পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষ অন্য দেশের মানুষ থেকে আলাদা। শুধু প্রত্যেক দেশই বলি কেন, একই দেশে নানা ধরনের মানুষ থাকে, যাদের দেহের গঠন বা আচার ব্যবহার সংস্কৃতির জন্যে আলাদা আলাদা দলে ফেলা যায়। আমাদের এই ভারতবর্ষেই এখনও এমন ধরনের মানুষ আছে যারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে মোটর গাড়ি তো দূরের কথা কোন গাড়িই দেখেনি।

পণ্ডিতেরা মানুষের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য আর অসাধারণ বৈচিত্র্যগুলি পর্যালোচনা করে এক বিজ্ঞানের প্রবর্তন করেছেন যার আলোচনার বিষয় 'মানুষ'। বিজ্ঞানের এ শাখার নাম নৃতত্ত্ব, ইংরেজিতে অ্যান্থ্রপোলজি—(অ্যান্থ্রপস্ = মানুষ)।

মানুষের কার্যকলাপ নিয়ে অবশ্য নৃতত্ত্বই একমাত্র বিজ্ঞান নয়। সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি, এ সবই মানুষের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু নৃতত্ত্বের সঙ্গে এ-সমস্ত বিজ্ঞানের তফাত এইখানে যে, বিজ্ঞানের এ-সব শাখা সাধারণত সভ্য মানুষের জীবন নিয়েই আলোচনা করে। আর নৃতত্ত্ব আলোচনা করে, একদিকে যেমন মানুষের অবয়বের দিক—তার শারীরিক গঠন, অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে তার পার্থক্য, আবার অন্যদিকে তার আচার,ব্যবহার, ধর্মবিশ্বাস,বাসস্থান, খাদ্য-সংগ্রহ বা উৎপাদনের

ব্যবস্থা, সমাজ গঠনের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রভৃতি। এ সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে নৃতত্ত্ববিদ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাহায্য নেন। নৃতত্ত্ববিদের আলোচনার বিষয় মানুষের জীবনের সমস্ত দিক এবং সব রকম বা সব কালের মানুষের জীবন।

মানুষের সভ্যতার লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় প্রায় ছ-হাজার বছর আগে থেকে। এরও আগেকার মানুষ তার কাজের সাক্ষী রেখে গেছে তার বাসস্থানে বা বাসস্থানের আশেপাশে, তার মৃতের সমাধি প্রভৃতিতে। এ সমস্ত সাক্ষ্য থেকে যে তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে তাতে মানুষের উৎপত্তি থেকে আজকের সভ্যতা পর্যন্ত একটা ক্রমিক ব্যাখ্যা তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে।

নৃতত্ত্ববিদ আরও এক ধরনের মানব-গোষ্ঠী সম্বন্ধে বিশেষভাবে সমীক্ষা করে মানব-সভ্যতার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে চলেছেন। এ হচ্ছে নিরক্ষর আদিবাসীদের জীবনযাত্রার বিশেষ সমীক্ষা। এ ধরনের অনেক আদিবাসী পৃথিবীর নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে যে-সব জায়গায় সভ্যতার আলো পৌঁছেছে অনেক দেরিতে। এইসব আদিবাসীর আচার ব্যবহার এবং ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে আধুনিক সভ্য মানুষের অনেক আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়, অনেক আধুনিক বিশ্বাসের ব্যাখ্যাও খুঁজে পাওয়া যায়।

নৃতত্ত্বের শাখা, উপশাখা

সংক্ষেপে বলতে গেলে, নৃতত্ত্বের আলোচনার বিষয় মানুষ আর তার কাজ। আজকের দিনে এই আলোচনার জন্যে এই বিজ্ঞান কয়েকটি বিশেষ-বিশেষ দিক থেকে আলোচনা চালাচ্ছে, উদ্দেশ্য, মানুষকে বিশদভাবে জানা। আর এই বিশেষ আলোচনা নিয়ে গড়ে উঠেছে নৃতত্ত্বের কতগুলি বিশেষ শাখা। বহু বিশেষজ্ঞ এর এক একটি শাখার চর্চায় সারা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন।

নৃতত্ত্ব বলতে এক সময় শুধু মানুষের আবয়বিক বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনাই বোঝাতো। তবে সাধারণভাবে এই বিজ্ঞানকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়। এক ভাগে আলোচনার বিষয় মানুষের দৈহিক বা আবয়বিক বৈশিষ্ট্য, অন্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের মিল এবং তফাত, মানুষের বিবর্তন ইত্যাদি। ইংরেজিতে নৃতত্ত্বের এই শাখার নাম Physical Anthropology বা আবয়বিক নৃতত্ত্ব।

নৃতত্ত্বের আর এক ভাগের আলোচনার বিষয় মানুষের কাজ। এর মধ্যে আসে প্রাচীন মানুষের জীবনযাত্রার আলোচনা, অর্থাৎ পুরাতত্ত্ব, মানুষের সামাজিক বিবর্তন, জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি। এই শাখার নাম Cultural Anthropology বা সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব। এর প্রত্যেকটা বিভাগই এক-একটা বিশিষ্ট বিধি অনুসারে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আর নতুন-নতুন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হচ্ছে। যেমন, পুরাতত্ত্ব বা প্রত্নতত্ত্ব। কাজ হল মানব-সভ্যতার লিখিত দলিল পাওয়ার আগে তার কাজের নিদর্শন থেকে মানুষের অগ্রগতির বিকাশ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। এ-কাজ কী করে করা হয় সে সম্বন্ধে বিজ্ঞান চেতনার 'প্রত্নতত্ত্বের কথা' অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

মানব-গোষ্ঠী তত্ত্ব (Ethnology) বিভিন্ন সংস্কৃতিক গোষ্ঠীর তুলনামূলক অনুসন্ধান করে মানুষের সংস্কৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গঠন করে। এর মধ্যে আসে মানুষের বিভিন্ন গোষ্ঠীর আচার, ব্যবহার, বাসস্থান, বিভিন্ন সংস্কৃতির সম্পর্ক, বিভিন্ন সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বিবর্তন ইত্যাদি।

নৃতত্ত্ববিদ্যার তথ্য-সংগ্রহ

নৃতত্ত্বচর্চায় নানারকমের মানব-গোষ্ঠীর সংস্কৃতির—অর্থাৎ তাদের জীবনযাত্রা-পদ্ধতির তুলনা করে মানব-সংস্কৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সূত্র গঠন করা হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই অনুশীলনের

বিষয়বস্তু নেওয়া হত আদিম বা বন্য জাতির জীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে। আদিম অধিবাসীদের সভ্য জগত থেকে যত দূরে পাওয়া যেত নৃতত্ত্ববিদ্যার এই শাখার বিজ্ঞানীদের উৎসাহ তত বেড়ে যেত। কোথায় দূর প্রশান্ত মহাসাগরের কোন্ এক দ্বীপে, অস্ট্রেলিয়ার কোন্ এক কোণায়, আসাম ব্রহ্মদেশের ঘন জঙ্গলের মধ্যে যে মানুষের দল শুধু মাছ ধরে বা ফলমূল কুড়িয়ে কিংবা পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে দিন চালিয়ে যাচ্ছিল— মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন, বন্দুক যাদের কাছে ছিল দুঃস্বপ্নের মত, নৃতত্ত্ববিদের দল তাদের মধ্যে বাসা বেঁধে দিনের পর দিন তাদের আচার, ব্যবহার, আহার, বিহার, বাড়ি-ঘর, ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে এসেছেন। এই তো সেদিন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ছাত্র ডাঃ ভেরিয়ার এলুইন এসে আমাদের দেশের নাগা, গোঁদ বা মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের জীবন সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন তার জন্যে নৃতত্ত্ববিদ্‌রা তাঁর কাছে চিরঋণী। এ কাজের জন্যে তিনি ঐ সব লোকের মধ্যে প্রায় মিশে গিয়েছিলেন এবং তারাও তাঁকে তাদেরই একজন বলে মেনে নিয়েছিল। এ-সব বিজ্ঞানী আদিবাসী এলাকায় সভ্যতার অনুপ্রবেশ ভীতির চোখে দেখেছেন। তাঁদের গবেষণায় ব্যাঘাত হবে এই আশঙ্কায় তাঁরা ভীত। আদিবাসীদের নিয়ে সমীক্ষা আজও চলছে। তবে, আদিবাসী সমাজ সম্পর্কে জানতে গিয়ে বিজ্ঞানী যে পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন আজ সভ্য সমাজের এক-এক অঞ্চল নিয়ে সমীক্ষা করতেও বিজ্ঞানী সেইরকম পদ্ধতিই অনুসরণ করেন। আগে যেমন বোর্নিও দ্বীপের ডায়াকদের সম্পর্কে ছিল নৃতত্ত্ববিদের ঔৎসুক্য, আজ তেমনি সুন্দরবনের গ্রামের অধিবাসীদের নিয়ে চলছে নানা ধরনের গবেষণা। চা-বাগানের শ্রমিকদের উপর আধুনিক সভ্যতার প্রভাব পড়েছে কতটা তাও আজ নৃতত্ত্ববিদের গবেষণার বিষয় বৈকি।

এ-সব গবেষণা থেকে যে-সব সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানী উপস্থিত হচ্ছেন তাতে তাদের গোষ্ঠীজীবনে বা ব্যক্তিগত জীবনে যে-সব সমস্যা দেখা যায় তার সমাধান করবার বিশেষ সুযোগ হচ্ছে।

তবে, আদিবাসী বা অসভ্য মানুষ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন বা করছেন তাঁদের একটা সুবিধে এই যে, অপেক্ষাকৃত কম-সংখ্যক মানুষের গোষ্ঠী নিয়ে তাঁদের কাজ করতে হয়। তাই তার জটিলতাও কম থাকায় মৌলিক সিদ্ধান্তে আসতে তাঁদের পক্ষে অনেক সুবিধে হয়।

অন্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক

মানুষ আর মানুষের সমাজ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে এ-রকম অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে নৃতত্ত্বের সম্বন্ধ আজ ঘনিষ্ঠ। মনস্তত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্বের তথ্যগুলিকে কাজে লাগাচ্ছেন। আবার নৃতত্ত্বের গবেষণার ক্ষেত্র দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে, আর তার নতুন-নতুন পথ বের হচ্ছে। বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর জীবন-যাত্রা, তাদের আবয়বিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে নতুন সিদ্ধান্তে আসছেন খাদ্য-বিজ্ঞানী। রোগ জরার বিরুদ্ধে চলছে নতুন সংগ্রাম। মানুষ মানুষের সেবা করবার নতুন নতুন রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে নৃতত্ত্বের নানা আবিষ্কার থেকে।

২

আদিম মানুষের সন্ধানে

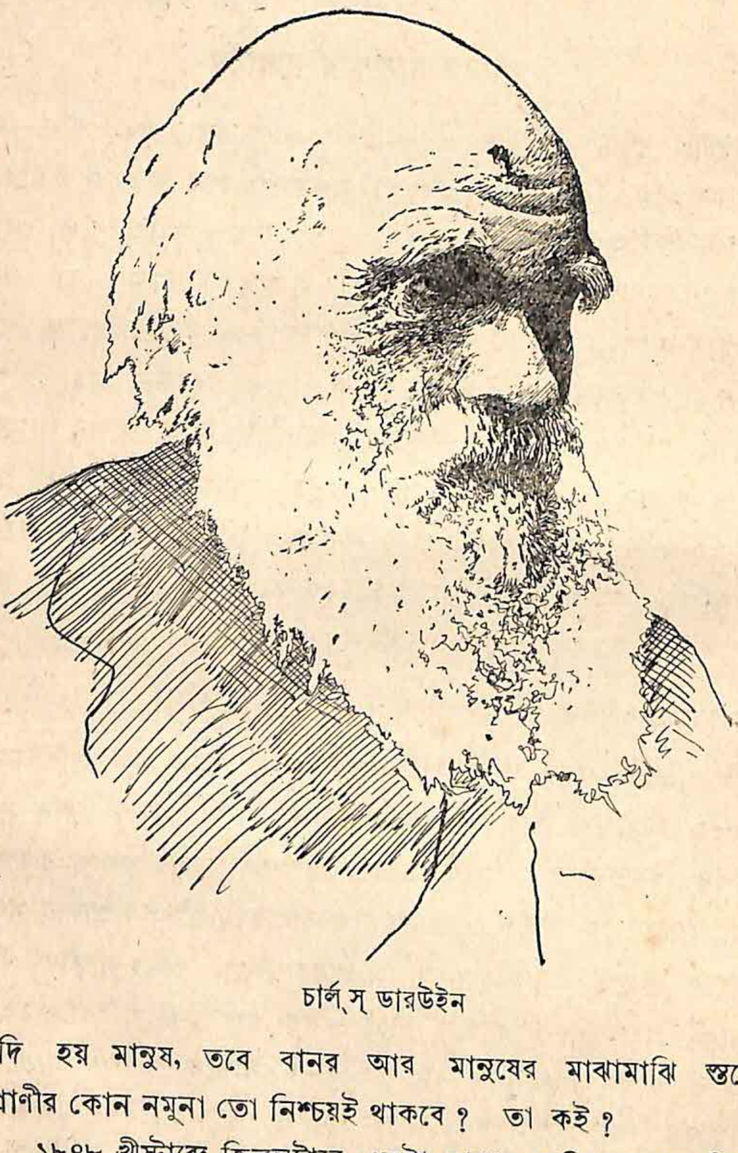
STATE INSTITUTE OF EDUCATION BANIPUR

মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা খুব বেশি দিন আরম্ভ হয় নি। প্রায় একশো সওয়াশো বছর আগেও ইউরোপ আমেরিকাতে বাইবেলের লেখা মানুষের জন্ম—অর্থাৎ ধুলো থেকে আদমের সৃষ্টি ইত্যাদি কাহিনীকেই সাধারণ লোক সত্য বলে বিশ্বাস করত। সামান্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিক যাঁরা সিদ্ধান্ত করে-ছিলেন যে বনমানুষ ইত্যাদি থেকে মানুষের বিবর্তন, তাঁরা বিশেষ পাত্তা পেতেন না। এই ধরনের বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন ল্যামার্ক আর চামার্স। এঁদের মত ছিল, মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মতই নিচু স্তরের জীব থেকে বিবর্তন লাভ করেছে। কিন্তু এঁরা নিজেদের সিদ্ধান্তকে যুক্তি দিয়ে জোরালো করতে পারেন নি। তাই অল্প লোকই এঁদের কথা মেনে নিয়েছিল।

চার্ল্‌স্‌ ডারউইন

এই চিন্তাধারায় সবপ্রথম বলিষ্ঠ ধ্বনি আনলেন ডারউইন। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বই 'অরিজিন অব্ স্পিসিস'-এ তিনি সব-প্রথম বিবর্তনবাদ সম্পর্কে এমন জোরালো তথ্য প্রকাশ করলেন যে, বৈজ্ঞানিক জগত, এবং এমনকি সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় পর্যন্ত বিশ্বাস করতে বাধ্য হল যে, মানুষের উদ্ভব বানর-জাতীয় জীব থেকে। প্রাকৃতিক কারণে ধীরে ধীরে শারীরিক পরিবর্তন আর উন্নতি হয়ে কোন এক ধরনের বানর মানুষে পরিণত হয়েছে। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ বিশেষ গঠনের বিশদ বিশ্লেষণ, বানরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে ডারউইন লিখলেন 'দি ডিসেণ্ট অব ম্যান।' প্রতিবাদও হল

বিস্তর। ধর্মীয় নেতারা তো বিরূপ হলেনই, এমনকি বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও প্রশ্ন দেখা দিল যে, বানরের বিবর্তনের পরিণতি



চার্ল্‌স্ ডারউইন

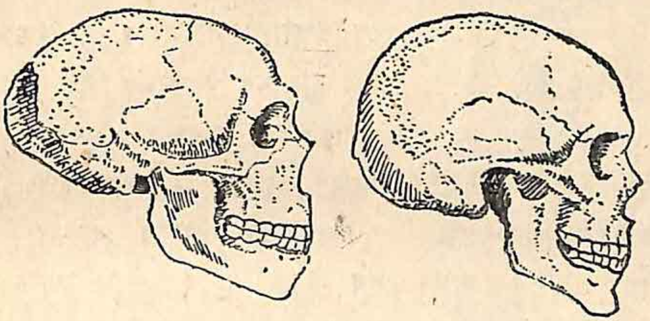
যদি হয় মানুষ, তবে বানর আর মানুষের মাঝামাঝি স্তরের প্রাণীর কোন নমুনা তো নিশ্চয়ই থাকবে? তা কই?

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে জিব্রলটারে একটা মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল যা অনেক প্রাচীন বলে মনে হয়। খুলিটা আয়তনে মস্ত

বড় ; মাথার উপরটা বেশ শক্ত, চোয়াল সামনের দিকে বের করা। চোখের উপরের হাড় বেশ উঁচু। মাথার খুলিটা আদিম মানুষের, কোন ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের, না কোন এক জাতীয় বানরের—এ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সে সময়ে সম্ভব না হওয়ায় এটাকে দিয়ে বিশেষ কিছু করা যায় নি।

'নিয়েনডারথাল' খুলি

১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে এইরকমই আর একটা মাথার খুলি জার্মানির



নিয়েনডারথাল খুলি আধুনিক মানুষের মাথার খুলি

ডুসেলডর্ফ শহরের কাছে আবিষ্কৃত হয়। এই খুলিটাকে বলা হয় 'নিয়েনডারথাল' মানুষের মাথার খুলি। এ খুলিটাও প্রকাণ্ড বড়, ভ্রূর উপরের হাড় উঁচু-উঁচু আর মাথার উপরের হাড় বেশ শক্ত। এর বিশদ বর্ণনা যখন প্রকাশিত হল তখন বৈজ্ঞানিক-দের মধ্যে নানা মত দেখা দিল। হাক্সলি তার 'ম্যান্‌স্ প্লেস ইন নেচার' বইতে নিয়েনডারথাল খুলির আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে নিয়েনডারথাল-এর হাড়গোড় থেকে এ-কথা বলা চলে না যে, নিয়েনডারথাল বানর আর মানুষের মাঝামাঝি কোন জীব। ডারউইন তাঁর 'ডিসেণ্ট অব্ ম্যান'-এ নিয়েনডারথাল-এর খুলির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি কোন মতামত প্রকাশ করেন নি।

গত একশো বছরে নিয়েনডারথালের বহু মাথার খুলি আর কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। এদের ভ্রূর উপরের মস্ত উঁচু ঢিবি পুরুষ-গরিলার ভ্রূ-দেশের সঙ্গে বেশ মিলে যায়।



নিয়েনডারথাল মানুষের মুখ

আমেরিকান বৈজ্ঞানিক হ্রডলিকা মনে করেন যে, আজকের মানুষ নিয়েনডারথাল মানুষের বংশধর। তিনি এবং আরো অনেকে বলেন যে, শিম্পাঞ্জি, গরিলা ও নিয়েনডারথাল হল মানুষের বিবর্তনের তিনটি ধারা।

বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ রবার্ট ব্রুম মনে করেন, নিয়েনডারথাল মানুষ খুব আদিম মানুষ নয়। এরা এক বিশেষ ধরনের মানুষ যারা প্লাইস্টোসিন যুগের শেষ দিকে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় এক লক্ষ বছর আগে দেখা দিয়েছিল। সম্ভবত উত্তর-মেরুর প্রবল শীতের দরুন এদের উদ্ভব হয়েছিল; তাছাড়া এরা পরবর্তী কোন মানুষ-দেহধারীর পিতৃপুরুষ নয় বলেই মনে হয়।

যাভা মানুষের আবিষ্কার

আদিম-মানুষ-সন্ধানীদের মধ্যে যাঁদের নাম করতে হয় তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য একজন হলেন এক ডাক্তার, নাম ইউজীন ডুবোয়া। আমস্টারডামে শারীর-বিদ্যা পড়াবার সময়ই তাঁর মনে ধারণা জন্মায় যে, মানুষের উদ্ভব হয় আফ্রিকা মহাদেশে যেখানে এখনও শিম্পাঞ্জি গরিলারা বাস করে, অথবা ইন্দোনেশিয়া বা মালয় অঞ্চলে যেখানে এখনও ওরাং ওটাং দেখা যায়।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি সুমাত্রা দ্বীপে একটি হাসপাতালে কাজ নিয়ে চলে আসেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে

চলতে থাকে তাঁর গবেষণা। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে যবদ্বীপে একটি প্রাচীন কালের মানুষের মাথার খুলি পাওয়া যায়। তবে, ডুবোয়া এতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে কেডুং ব্রুবাসে প্রথম ফসিলের সাক্ষাৎ পেলেন ডুবোয়া। এ ফসিল মানুষের আগের কোন স্তরের জীবের বলে তাঁর ধারণা হল। ফসিলে ছিল মাত্র নিচের এক পাটি চোয়াল আর একটি দাঁত। পরের বছর তিনি আবিষ্কার করলেন উপরের পাটির ডানদিকের একটা দাঁত। তিনি বললেন, এটা সম্ভবত কোন শিম্পাঞ্জির, যার মানুষের সঙ্গে খুব নিকট সাদৃশ্য আছে। তিন মাস পরেই এই জায়গার খুব কাছেই তিনি পেলেন আর-একটা দাঁত আর মাথার খুলির উপর-ভাগ যেটা পরে পিথেকেন্থ্রোপাস ইরেক্টাস বা যাভা-মানুষ নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। এই আবিষ্কারের সঙ্গেই একই জায়গায় একটা উরুদেশের হাড় পাওয়া গেল যেটা এবং মাথার খুলিটা একই জীবের বলে নির্ণীত হয়েছে।


জাভা মানুষের মুখ

ডুবোয়ার পর কনিংসওয়াল্ড্ আরো অনেকগুলি মাথার খুলির সন্ধান পান।

এই পিথেকেন্থ্রোপাস ইরেক্টাস-এর মাথার খুলি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক চলেছে। এখনও যে তা শেষ হয়েছে তা নয়। ডুবোয়া নিজে প্রথমে মনে করেন যে, এ জীব বানর এবং মানুষের মাঝামাঝি। কিন্তু পরে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এটা বিরাট এক গিবনের দেহাবশেষ। অন্য কোন নৃতত্ত্ববিদ মনে করেন, এটা হয়ত শিম্পাঞ্জির, গিবনের নয়। কিন্তু সে যাই হোক, ডুবোয়ার

কাছে বৈজ্ঞানিক জগত এজন্যে ঋণী যে তিনি তাঁদের অনুসন্ধানের একটা দরজা খুলে দিলেন যে দরজা দিয়ে সোটেনস্যাক, লিকি, কনিংসওয়াল্‌ড্‌ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা আদিম মানুষ সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করে আনতে পেরেছেন।

সোটেনস্যাক ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে একটি আদিম মানুষের চোয়ালের হাড় আবিষ্কার করেন। আধুনিক মানুষের চোয়াল থেকে এটা এত আলাদা যে এটাকে এক নতুন প্রজাতির (species) অন্তর্ভুক্ত



পিকিং মানুষের মুখ



রোডেশিয়ার মানুষের মুখ

করা হল। নাম দেওয়া হল 'হোমো হাইডেল্‌বারগিস'। মনে হয়, এই ধরনের মানুষ প্রায় ছ-লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে বাস করত।

গত পঞ্চাশ ষাট বছরে আরও বিস্ময়কর মাথার খুলি আবিষ্কৃত হয়েছে—রোডেশিয়ায়, প্যালেস্টাইনে, পিকিং-এ। এদের জীবনের ইতিহাস সম্পর্কেও নানা আলোচনা হয়েছে। কনিংসওয়াল্‌ড্‌ যবদ্বীপে আদিম যুগের দু-তিন ধরনের মানুষের দাঁত আবিষ্কার করেছেন। এদের মধ্যে 'ক্রোম্যানন' বলে ফরাসী দেশের এক জায়গায় কয়েকটি নরকঙ্কাল, করোটি ইত্যাদির আবিষ্কার উল্লেখ-যোগ্য। এই আবিষ্কারকে ভিত্তি করে মানুষের যে মূর্তি রচনা করা

হয়েছে তা থেকে মনে হয় যে আজকের মানুষেরই আকৃতি অবয়ব নিয়ে সুপুরুষ হয়েই জন্মেছিল সে মানুষ।

এস. বি. লিকি

এ প্রসঙ্গে একজন বৈজ্ঞানিকের কথা না বললে এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁর নাম ডাঃ লুইস এস. বি. লিকি। ইনি মানুষের পূর্বপুরুষের অনুসন্ধানে আজও লিপ্ত রয়েছেন সপরিবারে। যদিও ইংরেজ বংশে জন্ম, কিন্তু আফ্রিকার কিনিয়াই তাঁর দেশ এবং পূর্ব-আফ্রিকার আদিবাসীরাই তার আপন জন। ডাঃ লিকির জন্মও কিনিয়াতেই, ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে।

গত চল্লিশ বছর ধরে প্রাগৈতিহাসিক অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থেকে ডাঃ লিকি এবং পরে তিনি ও তাঁর স্ত্রী মেরি মানুষের পূর্বপুরুষ এবং মানুষ-জাতীয় জীবের অসংখ্য ফসিল, আদিম যুগের মানুষের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের অজস্র নমুনা সংগ্রহ করেছেন।

তাঁরা আবিষ্কার করেছেন নানা ধরনের আদিম মানুষের ফসিল। কিন্তু তাঁদের সবচেয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কার হল 'হোমো হ্যাবিলিস' নামে একটি জীব। এই জীবটি প্রায় কুড়ি লক্ষ বছরের প্রাচীন এবং অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন, এরাই মানুষের প্রকৃত পূর্বপুরুষ।

আদি মানুষের জন্মকথা নিয়ে যে আলোচনা চলছে, তার শেষ নেই। তবে গত পঞ্চাশ বছরে এ আলোচনা যেমন বেড়েছে, বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রও তেমনই বেড়েছে। দেশে দেশে চলছে গবেষণা, দেশে দেশে বের হচ্ছে নতুন নতুন জ্ঞানের নতুন নতুন আকর।

বৈজ্ঞানিকদের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ডাঃ লিকিই এক জায়গায় বলেছেন :

'যেমন যেমন নতুন নতুন নিদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগ আর প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত-

গুলিও অমনিই বদলায়। একটা কোন বিশেষ আবিষ্কার, যেমন ধরুন এই 'হোমো হ্যাবিলিস'ই বহুদিনের ধারণাগুলিকে চট করে বদলে দেয়। মানবীয় ফসিলের অভাব আর হাজার হাজার বছরের জ্ঞানের ফাঁকগুলি পূর্ণ করবার তাগিদ, এতেই জন্ম নেয় নানারকম সিদ্ধান্ত আর নানারকম তর্ক। তবে, এই নিয়েই আমাদের কাজ করে যেতে হবে। এ থেকেই আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার আলোকে যা কিছু করবার তা করে নিতে হবে।'

৩

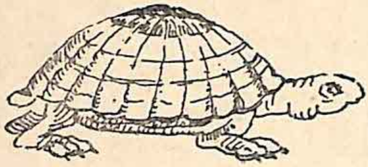
আদি মানুষের রূপ ও স্বরূপ

বানর আর মানুষ—এর মাঝামাঝি প্রাণী, অর্থাৎ বানর থেকে উন্নত হয়ে মানুষ সৃষ্টির স্তরগুলি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের তথ্যগুলি এখনও অসম্পূর্ণ। মানুষের উদ্ভব আর তার সভ্য জগতের অধিবাসী হবার প্রথম দিকের সাল তারিখ এতই কুহেলিকাচ্ছন্ন যে, আরও তত্ত্ব আর নির্দেশক না পাওয়া গেলে এ-সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না। এখনও পর্যন্ত সন তারিখের হিসেব একরকম মোটামুটি-ভাবে ধরা হয়,—কোন ক্ষেত্রে এক আধ লক্ষ বছর; কোন-কোন ক্ষেত্রে কয়েক হাজার বছরের তফাতকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া হয়ে থাকে।

ভূতত্ত্ববিদরা যে কল্পকে বলেন প্লাইস্টোসিন তারই মধ্যে মানুষের অস্তিত্বের সন্ধান মেলে—যদিও সে-যুগের মানুষের ফসিল যা পাওয়া গেছে তা এখনও হাতে গোনা যায়। প্লাইস্টোসিন যুগ এখন থেকে প্রায় দশ লাখ বছর আগে শুরু হয়ে বিশ থেকে ত্রিশ হাজার বছর আগে শেষ হয়েছে। তা-ছাড়া এখনকার কালে যেমন মানুষ বলতে একজাতীয় প্রাণীকেই বোঝায় (বিজ্ঞানের ভাষায় এই প্রজাতির নাম 'হোমো স্যাপিয়েন্‌স') প্লাইস্টোসিন-এর শুরুতে এই মানুষই অনেক বিভিন্ন ধরনের ছিল।

মানুষ প্লাইস্টোসিন কল্পেও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ইত্যাদির সঙ্গে যুঝতে অন্যান্য পশুপাখির চেয়ে কম দক্ষ ছিল। মেরু প্রদেশের ঠাণ্ডার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকবার জন্যে শ্বেত ভাল্লুকের দেহে লোম আছে। মানুষের দেহে তেমন কিছু নেই। মানুষের শরীর বিপদের হাত থেকে পালাবার পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। বাঘের সঙ্গে

দৌড়ে মানুষ পারে না—ততখানি ক্ষিপ্রতা তার নেই। কচ্ছপ বা কাঁকড়ার মত তার দেহ বর্মাবৃত নয়—বা বাঘ সিংহের মত তার দেহের বর্ণে আত্মগোপন করবার সুবিধে নেই। তা-ছাড়া বাজপাখির মত তার নখও নেই—অথবা সে-রকম সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তিও নেই।



কচ্ছপের দেহে রয়েছে শক্ত বর্মের আবরণ

মানুষের বৈশিষ্ট্য

মাছ থেকে জলজন্তু, তা থেকে সরীসৃপ এবং সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী জীব, আর অবশেষে বানর থেকে বনমানুষ, প্রায়-মানুষ এবং অবশেষে 'হোমো স্যাপিয়েন্‌স্'—মেরুদণ্ডী জীবের এই বিবর্তনের ধারায় রয়ে গেছে মানবের উত্তরাধিকার। এটাই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই বিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হল, চার পায়ে হাঁটা ছেড়ে দু-পায়ে ভর দিয়ে হাঁটা।

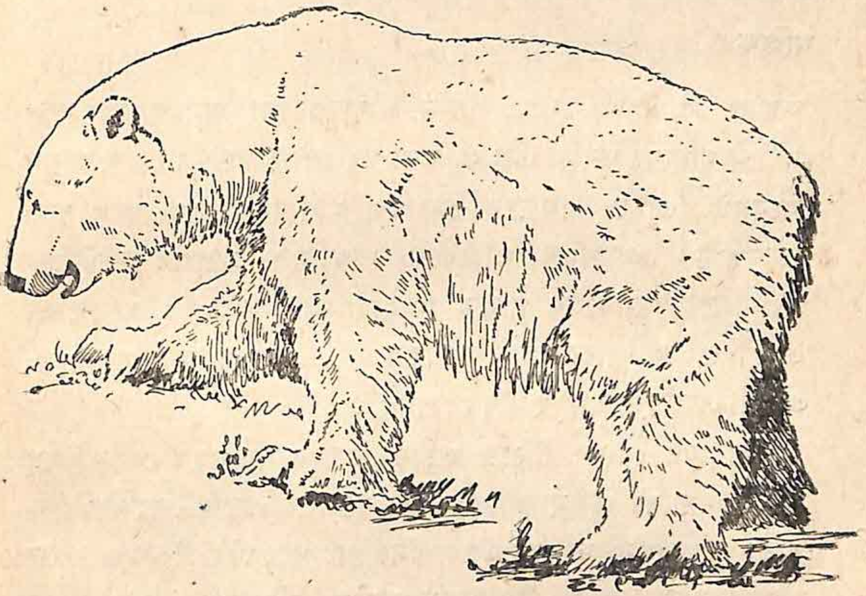
মানুষ সোজা হয়ে হাঁটে। প্রথম শুনলে মনে হয়, এ আবার কী? সোজা হয়ে হাঁটবে না, দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে না তো কি গরু ঘোড়ার মত চার পায়ে চলে বেড়াবে মানুষ?

আসলে কিন্তু এই খাড়া অবস্থায় আসতে মেরুদণ্ডী জীবকে অনেক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে। এইভাবে মাছ থেকে মানুষে পরিণত হতে তাকে অনেক কিছু ছাড়তে হয়েছে; লাভও অবশ্য হয়েছে অনেক।

সোজা হয়ে দাঁড়ানোর জন্যে মানুষের দেহের ভারকেন্দ্র খানিকটা সরে গিয়ে দেহের মাঝামাঝি পেলভিস্ উরুর হাড় আর পায়ের হাড়ের উপর পড়েছে। তার ফলে এ হাড়গুলির আকারের পরিবর্তন হয়েছে।

সোজা হয়ে দাঁড়ানো

রক্ত চলাচলের ব্যাপারেও সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে মানুষের বেশ খানিকটা অসুবিধেই হয়েছে। কারণ মানুষের দেহের রক্তকে মাধ্যাকর্ষণ ঠেলে জমি থেকে অন্তত চার, সাড়ে চার ফুট উঠতে হয়, কেন না মানুষের দেহে হৃৎপিণ্ডের অবস্থান প্রায় অতটাই উঁচুতে।



শ্বেত-ভাল্লুকের লোমশ দেহ মেরুপ্রদেশের ঠাণ্ডার সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে

শরীরের সমস্ত ভারটা পায়ের উপর পড়ার কথা আগেই বলেছি। এ প্রসঙ্গে এক বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বানরদের হাত-পা চারটেই গাছের ডাল ইত্যাদি ভাল করে আঁকড়ে ধরার উপযোগী। অন্যদিকে মানুষের পায়ের আঙুলের গড়ন বদলে ভার ধারণ করবার উপযোগী হয়েছে। তাই পায়ের আঙুল হয়ে গেছে ছোট। পায়ের গোড়ালি, অ্যাঙ্কল জয়েন্ট এবং পায়ের পাতার হাড়,

সব মিলিয়ে হয় মানুষের গোটা পায়েরই অর্ধেক। শিম্পাঞ্জির এই অংশ গোটা পায়ের এক-পঞ্চমাংশ, পায়ের আঙ্‌ুলের দৈর্ঘ্যে বাকিটা জুড়ে থাকে।

মানুষের দৃষ্টিও গরু ইত্যাদি প্রাণী থেকে তফাত। মানুষের চোখদুটি থাকে সামনে এবং পরস্পরের কাছাকাছি। ফলে, যে জিনিস সে দেখে তা একই সঙ্গে দু-চোখে দেখে। বানর জাতীয় কোন-কোন প্রাণীর মানুষের মত সামনে চোখ।

মস্তিষ্ক

অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে, এমনকি বানর বা বনমানুষের সঙ্গে যেখানে মানুষের তফাত এবং যে তফাতের জন্যে বিবর্তনের ধারায় মানুষ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে সে হল মানুষের মস্তিষ্ক, আর সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডলী। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধে মানুষের শারীরিক অক্ষমতাকে অনেকাংশে পুষিয়ে দিয়েছে তার অধিকতর শক্তিশালী এবং বিরাট আকারের মগজ বা মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্কই মানুষের সুদূর-প্রসারী এবং সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডলীর কেন্দ্র।

মানুষের যে-সব ইন্দ্রিয় রয়েছে তাদের সাহায্যেই কোন বিষয় সম্বন্ধে মানুষের চেতনা জাগে। এর ফলে যে প্রবৃত্তি এবং শারীরিক গতির প্রয়োজন তা সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ঠিক-ঠিক মত কাজে লাগানোর মূলে রয়েছে এই মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী।

মস্তিষ্কের বিবর্তন

যে চেতনার জন্যে মানুষ তার দৃষ্টি, তার মাংসপেশীর ব্যবহার, তার শ্রবণ-শক্তিকে যথেচ্ছ পরিচালিত করতে সমর্থ হয় তার কেন্দ্রস্থল হল মানুষের মস্তিষ্ক। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনেকগুলি স্বতন্ত্র বোধশক্তির সমন্বয় করে নিজের গতিবিধিকে আরও ভালভাবে চালিত করতে পারে। এর কারণ এই যে, মানুষের শিশুর মাথার হাড় অনেকটা নরম থাকে, আর তার গঠন থাকে

আলগা, যাতে মস্তিষ্কের বৃদ্ধি হতে কোন অসুবিধে না হয়। কিন্তু যতদিন না মস্তিষ্ক বৃদ্ধি পেয়ে পরিণত না হয় ততদিন মানব-শিশু বড়ই অসহায় থাকে। মানুষের শিশু যত বাপ-মার উপর নির্ভরশীল তত আর কোন জীবই নয়। এই পরনির্ভরশীলতা দীর্ঘকাল পর্যন্ত থাকে। মানুষের সহজাত বৃত্তিগুলি (instinct) অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে অনেক কম থাকে।

এখানে বানর বা বনমানুষের তুলনায় মানুষের মস্তিষ্কের আকারের তুলনা করা যেতে পারে। সভ্য মানুষের মাথায় ১৪৫০ সি-সির মতন মস্তিষ্ক ধারণ করবার জায়গা আছে। বনমানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় গরিলা, তাদের মাথায় ৪০০।৫০০ সি-সির মত মস্তিষ্ক থাকে। অবশ্য হাতির মস্তিষ্ক মানুষের চেয়ে আকারে বড়, কিন্তু হাতির দেহের তুলনায় তার মস্তিষ্কের ওজন যা সে অনুপাতে মানুষের মস্তিষ্ক অনেক বেশি ভারি। অবশ্য মানুষ, বানর, বন-মানুষের মস্তিষ্কের গঠন প্রায় একই ধরনের। বানর বা বন-মানুষের মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের সরল সংস্করণ আর-কি।

অন্যান্য প্রাণীর বাচ্চাদের মত মানুষের শিশুকেও অভিজ্ঞতা থেকেই শিখতে হয়। অর্থাৎ কোন এক বিশেষ অবস্থাকে কি-ভাবে ব্যবহার করা যায় তা থেকেই তাকে ভবিষ্যত কর্ম-পদ্ধতির জন্যে তৈরি হতে হয়। অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের মধ্যে দেখা যায় যে বাপ-মায়ের উদাহরণ দেখে তাদের শাবকেরা অনেক কিছুই শিখে নেয়। মানব-শিশু তেমনি বাপ মাকে অনুকরণ করেই পায় অনেক শিক্ষা। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা তারা বাপ মা বা বড়দের কাছ থেকে শুধু তাদের অনুসরণ করেই পায় না। আরো বিশেষ ধরনের শিক্ষার বন্দোবস্ত মানব-শিশুর আছে। তা হচ্ছে, কথার সাহায্যে কোন কিছু শিখে নেওয়া।

S.C.E.R.T., West Bengal
Date..........
Acc. No..........
S.C.E.R.T., West Bengal Library
STATE INSTITUTE OF EDUCATION BANIPUR

মানুষের শিশু—পরমুখাপেক্ষী

অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে মানুষের শিশুকে বাপ মা-র কাছে অনেক বেশি দিন থাকতে হয়। বাপ মা-র কাছে প্রথম সে কথা বলতে শেখে। জিনিসের নাম, কোন কাজ বোঝাবার জন্যে বলা শব্দ, দিনে দিনে এগুলি শেখার সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে অনেক রকমের জিনিস, অনেক রকমের কাজ ভাষার মধ্য দিয়ে বলতে শেখে মানব-শিশু। এই কথাগুলি কতগুলি শব্দের সমষ্টি, যার মানে এক-ভাষা-ভাষী মানুষের দল একই ভাবে বুঝে নেয়। এই ভাষার মধ্য দিয়ে বাপ মা শিশুকে এমন অনেক বিষয়ে শিক্ষা দেয় যেটা তারা উদাহরণ দিয়ে শেখাতে পারে না। এইখানে অন্য জীব-জন্তুর সঙ্গে মানুষের মস্ত তফাত। যেমন ধরা যাক, কোন বিপদ থেকে দূরে থাকার জন্যে মানুষ তার নিজের সন্তান সন্ততিকে ভাষা দিয়েই সাবধান করে দেয়। বলে দেয়, কেমন করে বিপদকে এড়ানো যেতে পারে। অন্য জন্তুদের বেলা কিন্তু এরকমটি হয় না। ভাষার সাহায্যেই বাপ মা মানব-শিশুকে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে দেয়। ছোট বাচ্চাটি নোংরা জল খেতে গেলে বাপ মা বারণ করেন—খেয়ো না, খেলে অসুখ করবে। এগুলো অভিজ্ঞতার কথা।

আবার বাপ মা ছাড়াও এক-ভাষা-ভাষী গোষ্ঠীর লোকেরা পরস্পরকে জানায় তাদের দেখা, শোনা, জানা ঘটনা বা জিনিসের কথা। তার মানে, সমস্ত গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাটা জড় করা যায় ভাষার সাহায্যে। বাপ মা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা ছাড়াও তাই সন্তানদের জানায় অনেক কালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার কথা, যা পুরুষানুক্রমে তাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। ভাষার মাধ্যমে এই সঞ্চিত জ্ঞান এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে পৌঁছনো—মানব জাতির এইটাই সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব। আর বানর বা বন-মানুষ থেকে ক্রমোন্নতির শেষ পর্যায়েই এটা সম্ভব হয়েছে। এই

শক্তিই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে বিশিষ্ট করেছে। পশুপ্রাণীদের মধ্যে অভিজ্ঞতা পুরুষানুক্রমে চলে আসে তাদের বোধশক্তির (instinct) মধ্য দিয়ে। প্রকৃতির নির্বাচনে অনেক সময়ে এই বোধশক্তি কাজ দেয় নি ; তাতে প্রাণীর সেই প্রজাতিকে প্রজাতি ধ্বংস পেয়েছে। সেই তীক্ষ্ন বোধশক্তি হারিয়েও মানুষ তার অভিজ্ঞতা জড় করবার ক্ষমতা দিয়ে প্রকৃতিকে তুষ্ট করবার উপায় খুঁজে পেয়েছে। এমনিভাবে প্রাকৃতিক বিরূপতাকে সে জয় করতে পেরেছে।

এই পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতাও আবার পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। মানুষ বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। তাই অভিজ্ঞতা-লব্ধ বিশ্বাসের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার আঘাত যখন আসে তখন তার মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব শুরু হয়। পরিবর্তনের প্রতি বিতৃষ্ণা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে তাকে পুরোনো ধারণা, পুরোনো জীবন-ধারণ প্রণালী থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা যা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সম্পত্তির মতনই সযত্নে রক্ষিত হয় তাও পাল্টাতে হয়। পুরোনো চিন্তাধারার জায়গায় আসে নতুন চিন্তাধারা—নতুন নতুন পদ্ধতির হয় উদ্ভব—মানুষের ইতিহাসে এরই নাম প্রগতি।

সম্মিলিত অভিজ্ঞতা

প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রাচীন মানুষের সংস্কৃতি ইত্যাদির নিদর্শনের মধ্যে এই ক্রম-পরিবর্তনের, এই প্রগতির চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। মানুষ গোষ্ঠীর সম্মিলিত অভিজ্ঞতা এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে পৌছে জীবন-যাত্রার নতুন পদ্ধতি সৃষ্টি করেছে। এক যুগে মানুষ গাছের গুড়ি কুরে কুরে নৌকো বা শাম্পান বানিয়ে তাতে জলযাত্রা করতে শিখেছে—অথবা কাপড় বা মাদুর বুনতে শিখেছে। আবার তারপর এই কয় রকমের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তী যুগে তাদের সন্তান সন্ততিরা চালিয়েছে পাল-তোলা

নৌকো, যাতে নৌকো তৈরি করা, নোকো চালানো, কাপড় বোনা, এ সব কাজের শিক্ষাই দরকার হয়।

ভাষা সম্পর্কে আরও একটা কথা এই যে, মানুষ যেমন শব্দ দিয়ে নিজের মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করতে শিখেছে তেমনি বহু অতীত কাল থেকেই হাবে ভাবে, ছবি এঁকে নিজের উদ্দেশ্য প্রচার করবার প্রথার প্রচলন করেছে।

৪

নানা জাতের মানুষ

এককোষী প্রাণী অ্যামিবা থেকে প্রাণী-জগতের ক্রম-বিবর্তনের কথা বিজ্ঞান চেতনার অন্যত্র বলা হয়েছে। আজকের পরিণত মানুষ দশ থেকে কুড়ি লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে দেখা দিয়েছিল। যেখানেই সে থেকেছে সেখানেই তাকে লড়াই করতে হয়েছে চারদিকের জল, হাওয়া, রোদ, বর্ষা, বুনো জন্তু, রোগ বালাইয়ের সঙ্গে। নানা কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিল বিভিন্ন ধরনের মানুষ। এক অঞ্চলের মানুষের আকৃতিতে অন্য-অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে কিছু-কিছু পার্থক্য দেখা যায়,—যেমন চামড়ার রঙে কেউ ধবধবে সাদা, কেউ মেটে-মেটে, কেউ ঘোর কালো। এ ছাড়া মাথার আকৃতি, চুলের গঠন ইত্যাদিও এক-এক ধরনের মানুষের এক-এক রকমের।

সাধারণত পৃথিবীর এক-এক অঞ্চলের মানুষদের এক-এক ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকে। তা থেকে তাদের এক-এক পর্যায়ে ফেলা হয়। এমন একটা সময় ছিল যখন এক পর্যায়ের মানুষ নিজেদের মনে করত অন্য পর্যায়ের মানুষের চেয়ে স্বভাবত উন্নত—অর্থাৎ প্রকৃতিই তাদের উন্নত করে পৃথিবীতে এনেছে, আর তারাই অন্য পর্যায়ের মানুষের উপর প্রভুত্ব করবার অধিকারী। এই ধারণা আজ অনেক বদলেছে। এক সময় যাদের মনে করা হত নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ, আজ তাদের মধ্য থেকেও বের হচ্ছে বিশিষ্ট নেতা, দার্শনিক, সমাজ-বিজ্ঞানী। শুধু এই নয়, প্রমাণ হয়ে গেছে যে, সুবিধে সুযোগ পেলে তারাও এক-এক বিষয়ে তথাকথিত উন্নত পর্যায়ের লোকেদের পেছনে ফেলতে পারে।

তিনটি প্রধান ভাগ

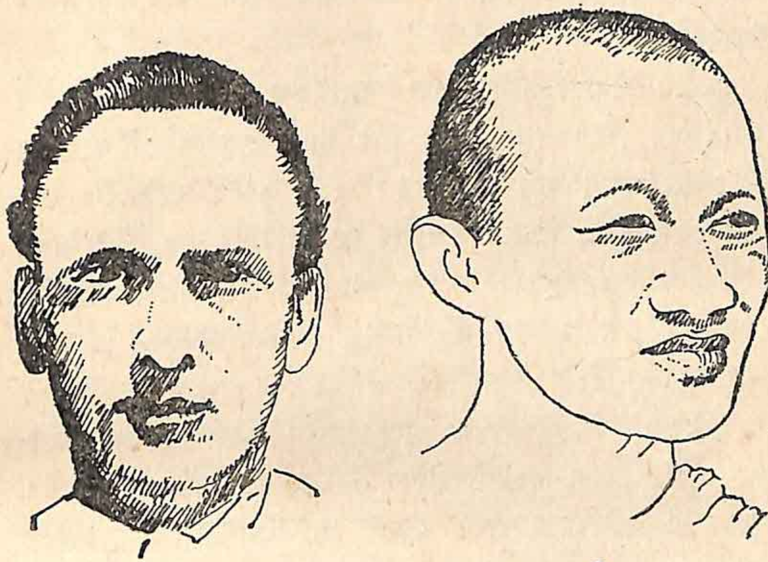
মানুষ-জাতিকে তাদের চুলের গঠন দিয়ে সাধারণত তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগে আসে 'নিগ্রোজাতীয়' মানুষ। এদের চুল ঘন, কুঞ্চিত; আর নাক থ্যাবড়া। এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে আফ্রিকার বান্টু ভাষা-ভাষী মানুষ, দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যান আর হটেনটট্, পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রো, আফ্রিকার আর মালয়েশিয়ার বামনাকৃতি নেগ্রিটো, আন্দামানের আদিবাসী ইত্যাদি। সব সময়েই যে এই শ্রেণীর লোকেদের রঙ ঘোর কালো হয় তা নয়। অনেকেরই রঙ কালো, তবে কেউ-কেউ মেটে রঙের বা হলদে ধরনেরও হয়। অধিকাংশেরই আবার মাথার খুলি সরু ধরনের। তবে, এর ব্যতিক্রম যে দেখা যায় না তা নয়।



নিগ্রো

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে, যারা নিজেদের শ্বেত-জাতীয় মানুষ বা ইউরোপীয় জাতীয় মানুষ বলে। এদের চুল ঢেউ-খেলানো। এই শ্রেণীর লোক বাস করে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে, ভূমধ্যসাগরের তীরে, এশিয়া মাইনরে, ভারতবর্ষে। জাপানের আইনোরাও নাকের আকার ও চুলের গঠন অনুসারে ইউরোপীয়দের সমপর্যায়েই পড়ে, যদিও তাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি জাপানের অন্য শ্রেণীর অধিবাসীদেরই মত। ইউরোপীয় শ্রেণীর মানুষের গায়ের রঙ শাদা অথবা কটা আর মাথার খুলি চওড়া অথবা সরু হতে পারে।

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে মঙ্গোলীয় ধরনের মানুষ। এদের চুল পাতলা আর সোজা। এই শ্রেণীর লোকেদের নাকের গঠন



আধুনিক ইউরোপীয়　　মঙ্গোলীয়

মাঝামাঝি,—না টিকলো, না একেবারে থ্যাবড়া। এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই এদের বাস। আমেরিকার এস্কিমোরা এই শ্রেণীতে পড়ে। এদের অধিকাংশের মাথার খুলি চওড়া।

বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য

মানুষের অবয়বে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে নৃতত্ত্ববিদরা তাকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করেন। এই বৈশিষ্ট্য সাধারণত মানুষ তার পূর্বপুরুষের কাছ থেকে বংশানুক্রমে পেয়ে থাকে। মানুষের যে-সব দৈহিক বা আবয়বিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এবং তাদের পরিমাপ করা যায়, শ্রেণী-বিভাগের সেগুলিই হয় ভিত্তি। যে-সব অবয়বের সাধারণত পরিমাপ নেওয়া হয় তা হচ্ছে: (১) শরীরের দৈর্ঘ্য, কাঁধ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য, বসে থাকা অবস্থার উচ্চতা, কাঁধের প্রস্থ, বুকের ছাতির মাপ, পাছার মাপ ইত্যাদি, (২) হাত পা ইত্যাদি

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি, (৩) করোটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, মুখের মাপ, নাকের আকৃতি, এবং (৪) শরীরের ওজন, দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্নিবেশ, এক অঙ্গের সঙ্গে আর-এক অঙ্গের সংস্থানের ডিগ্রি ইত্যাদি।

এই যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলা হল এগুলি নানারকম মাপবার যন্ত্র দিয়ে মাপা যায়। এ ছাড়া শুধু লক্ষ্য করে যে বৈশিষ্ট্যগুলি জানা যায় তা হচ্ছেঃ (১) চুলের স্বাভাবিক রঙ, গায়ের লোমের রঙ, চোখের তারার রঙ, চামড়ার রঙ, (২) মাথা, মুখমণ্ডল ও দেহে চুলের ঘনত্ব ও আকৃতি, (৩) নাকের আকৃতি, নাকের দুই গহ্বরের তফাত, কানের চেহারা, থুতনি, চোয়াল, গালের হাড়, ঠোঁট ইত্যাদি, (৪) চোখের আকার, চোখের পাতার ধরন, ভ্রূর উপরকার হাড়ের গঠন এবং করোটির অংশ-বিশেষের গঠন, এবং (৫) শরীরের বিভিন্ন অংশে চর্বি এবং পেশীর অবস্থান ও শরীরের সাধারণ গঠন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নৃতত্ত্ববিদ মডেল বা চার্টের সাহায্যে অনুশীলন করেন।

মাথার পরিমাপ

বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপের ব্যাপারে নৃতত্ত্ববিদ সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্য নেন। এ বিষয়ে যে ব্যাপারে এঁরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন তার একটি হল মাথার খুলির পরিমাপ। মাথার খুলির আকার অনেক রকমের থাকেঃ কারো মাথা চ্যাপটা, কারো বা লম্বা, আবার কারো চোয়ালের হাড় অনেকখানি বের করা থাকে। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদ সাধারণত মাথার সবচেয়ে বেশি দৈর্ঘ্য আর সবচেয়ে বেশি চওড়া দিকের মাপ নেন। জীবিত মানুষের মাথার এই মাপকে ইংরেজিতে বলে 'সেফালিক ইনডেক্স' (Cephalic Index), আর করোটির এই মাপকে 'ক্রানিয়াল ইনডেক্স' (Cranial Index)।

কারোটির মাপের জন্যে একটি সূচক বা ইনডেক্স ব্যবহার করার রীতি আছে। মাথা বা করোটির সবচেয়ে বেশি দৈর্ঘ্য যা পাওয়া যায় তাকে করোটির সবচেয়ে বেশি প্রস্থ দিয়ে ভাগ করে নিতে হয়। তারপর এই ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করে নিলে যে সংখ্যাটি হল সেইটিই হল ইনডেক্স বা সূচক মান।

এই সূচকের ভিত্তিতে মাথাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) যেখানে সূচক ৮২-র বেশি অর্থাৎ মাথা অপেক্ষাকৃত ছোট অথবা চওড়া, তাকে বলা হয় ব্র্যাকিসেফালিক (brachycephalic), (২) যেখানে সূচক ৭৭ থেকে ৮২ অর্থাৎ মাঝারি মাপের, তাকে বলা হয় মেজোসেফালিক (mezocephalic.), আর (৩) যেখানে সূচক ৭৭-এর নিচে, অর্থাৎ মাথা অপেক্ষাকৃত লম্বা বা সরু, সেখানে তাদের নাম দেওয়া হয় ডলিকোসেফালিক (dolichocephalic)।

করোটির বেলায় এই সূচক সামান্য কম ধরা হয়। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণী-বিভাগের জন্যে সূচকের সংখ্যা মনগড়াভাবে ধরা হয়েছে, অবশ্য তা কাজের সুবিধের জন্যেই।

ত্বকের রঙ আর চুলের গঠন

চুলের গঠন অনুসারে পৃথিবীর মানুষকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়, এ কথা আগেই বলেছি। চুলের রঙ আর শরীরের নানা অংশে এর ঘনত্ব নানা লোকের মধ্যে নানাভাবে দেখা যায়। নিগ্রোজাতীয়, শ্বেতজাতীয় ও মোঙ্গোলজাতীয় মানুষের চুলের গঠন এক-এক বিশেষ ধরনের। নিগ্রোজাতীয় লোকেদের মধ্যে আবার পপুয়ান বা ম্যালেনেশিয়ানদের চুল লম্বা হয়, নিগ্রোদের হয় ছোট-ছোট কোঁকড়ানো চুল। বুশম্যান উপজাতীয় মানুষের চুল হয় খুব ছোট আর প্যাঁচানো, অনেকটা স্ক্রু র মত। তেমনি ইউরোপীয়দের মধ্যে কারো চুল একেবারে সোজা, কারো আবার ঢেউ-খেলানো। নিগ্রো বা ইউরোপীয়দের চুলের রঙ

সাধারণত কালো, তবে ইউরোপীয়দের মধ্যে লাল রঙের চুলও দেখা যায় কোন-কোন অঞ্চলের লোকের মধ্যে, যেমন ওয়েল্‌স্‌, স্কটল্যাণ্ড বা আয়ারল্যাণ্ডের লোকের মধ্যে। ইহুদিদের বা ফিনল্যাণ্ডের লোকেদের মধ্যেও এই রঙের চুল সাধারণত দেখা যায়। ইউরোপীয় মানুষের দেহে চুলের সমাবেশ কম-বেশি প্রত্যেকেরই আছে; নিগ্রোজাতীয় লোকেদের দেহে চুল থাকে খুবই কম।

চামড়ার রঙ হচ্ছে এমন একটা বৈশিষ্ট্য যা নিয়ে একদা শ্বেতজাতীয় লোকেরা কৃষ্ণাঙ্গ বা অন্যান্যদের চেয়ে নিজেদের উন্নত বলে জাহির করত। চামড়ার রঙের সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বের কোন সম্পর্ক আছে বলে নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন না। একজন বিশিষ্ট শারীর-তত্ত্ববিদ একবার বলেছিলেন যে, একজন ইউরোপীয় ও একজন আফ্রিকান নিগ্রোকে যদি চামড়া ছাড়িয়ে রাখা যায়, আর চামড়া, চুল এবং মুখ সরিয়ে ফেলা হয় তবে ধরা মুস্কিল কে কোন্ শ্রেণীর লোক। কথায় বলে, চামড়ার তলায় সব মানুষই এক জাতি।

চামড়ার রঙ কালো হবার কারণ, মানুষের দেহে চামড়াকে কালো রঙ করবার উপাদানের প্রাচুর্য। এই উপাদানকে বলে মেলানিন (melanin)। এ ছাড়া চামড়ার নিচে রক্ত-প্রবাহের প্রাচুর্যও চামড়ার রঙের জন্যে দায়ী। আর একটি কারণ হল চামড়ার নিচে মরা কোষগুলির আপেক্ষিক ঘনত্ব। এই তিনটি কারণেই মানুষের চামড়ার রঙ সাদা বা কালো হয়। তবে, দেহের মধ্যে সাদা রঙ তৈরি করার কোন বিশেষ উপাদান থাকে না।

হয়ত প্রাকৃতিক নির্বাচনের কারণে সূর্যকরোজ্জ্বল দেশগুলির অধিবাসীদের দেহে মেলানিনের প্রাচুর্য দেখা যায়। সূর্যের তাপ থেকে কালো রঙের কৃষ্ণাঙ্গদের রক্ষা করে বেশি মেলানিন। এদের ঘামবাহী গ্ল্যাণ্ডগুলিও এর জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বোধহয়

এই কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন উষ্ণ অঞ্চলে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের প্রাদুর্ভাব, এবং বিভিন্ন উপজাতির মানুষের মধ্যে রঙের এই উপাদানটি কম-বেশি দেখা যায়।

চোখের গঠন ও রঙ

চামড়ার মত চোখের রঙ ও গঠনও নানা রকমের দেখা যায় বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে। চোখের তারার রঙ সাধারণত সূর্যালোক থেকে চোখকে রক্ষা করার জন্যেই বিশেষ ধরনের হয়ে থাকে। সূর্যের আলো যে দেশে প্রচুর সেখানে সাধারণত মানুষের চোখের তারার রঙ কালো। যে-সব মানুষের চোখের তারার রঙ হালকা, চোখ বাঁচাবার জন্যে এ-সব দেশে তাদের কালো চশমা পরা দরকার হয়ে পড়ে।

মঙ্গোলীয় মানুষের মধ্যে সাধারণত 'বাদাম-চেরা' চোখ দেখা যায়। আবার এশিয়ার কোন-কোন অঞ্চলের লোকের চোখের উপরের পাতার চামড়ায় একটা ভাঁজ দেখা যায় যাতে উপর-পাতার সবটা অথবা তার অংশবিশেষ ঢাকা থাকে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় একে বলে এপিক্যান্থিক ফোল্ড (epicanthic fold)।

নাকের গঠন

আদিম মানুষেরই বোধহয় নাক চ্যাপটা এবং চওড়া। প্রকৃতির নির্বাচনে মানুষ যত এগিয়েছে, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে তার নাকের গঠন তত তীক্ষ্ণ হতে তীক্ষ্ণতর হয়ে চলেছে। গরম ও আর্দ্র অঞ্চলে নাক সাধারণত চ্যাপ্টা, এবং ঠাণ্ডা দেশে নাক উন্নত ও তীক্ষ্ণ দেখা যায়। তার কারণ হয়ত এতে ফুসফুস পর্যন্ত পৌঁছনোর আগে নিশ্বাসের বায়ু বেশ গরম হয়ে যেতে পারে।

শারীরিক দৈর্ঘ্য ও দেহের গঠন

শারীরিক দৈর্ঘ্যও মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য। কোন দেশের লোক সাধারণতই বেশ লম্বা, আবার কোন দেশের লোক বেঁটে। সুদানের নিগ্রোরা সাধারণত পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মানুষ, আর আফ্রিকার চাদ হ্রদের ধারের বামনরা হল সবচেয়ে বেঁটে জাতের। এদের গড়পড়তা দৈর্ঘ্য চার ফুট ছ-ইঞ্চি। জাপানীদের সাধারণত বেঁটে জাতের লোক বলে ধরা হয়। কিন্তু এই জাপানীদের যারা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বা ফিলিপাইন দ্বীপে বসবাস করছে তাদের সন্তান সন্ততি সাধারণ জাপানীদের চেয়ে কয়েক ইঞ্চি লম্বা হতে দেখা গেছে।

দেহের আকারের সঙ্গে খাদ্যের বিশেষ সম্পর্ক আছে। গবেষণা দ্বারা এ ব্যাপারটা প্রমাণিত হয়েছে। একই বংশের ইঁদুরকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য খাইয়ে দেখা গেছে যে, তারা শারীরিক দিক দিয়ে বিভিন্ন ভাবে গঠিত হয়েছে। পাঠানরা দৈহিক স্বাস্থ্যে শ্রেষ্ঠ। তারা যে খাদ্য খায় সেই ধরনের খাদ্য খাইয়ে ইঁদুরের স্বাস্থ্য ভাল করা সম্ভব হয়েছে। তা-ছাড়া তাদের রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতাও জন্মেছে বেশি। আবার দক্ষিণ ভারতীয়দের খাদ্য খাইয়ে সেইজাতীয় ইঁদুরেরই বাচ্চা জন্মেছে রোগা আর ক্ষীণ-জীবী।

জলবায়ু

জলবায়ুর প্রভাব মানুষের শারীরিক আকৃতির উপর সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। নানা দেশের নানা জলবায়ুতে মানুষ নিজেকে অভ্যস্ত করে নিতে নিতে কিছু কিছু দৈহিক গড়ন ইত্যাদিও বদলে নেয়। রোদের দেশে এলে সাধারণত সাদা চামড়ার রঙ তামাটে বা কালচে হয়ে যায়। কোন বিশেষ ধরনের জলবায়ুতে কোন এক মানব-গোষ্ঠী এক নাগাড়ে বহুদিন ধরে থাকতে থাকতে

তারা সে জায়গার জলবায়ুর কঠোরতা প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা আয়ত্ত করে। এটা ঘটে প্রাকৃতিক কারণেই। নিগ্রোদের চুলের বিশেষ আকৃতি তাদের গরম প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। বংশানুক্রমে একই জলবায়ুর মধ্যে থাকতে থাকতে তাদের এই বৈশিষ্ট্য জন্মেছে। সাইবেরিয়ার মঙ্গোলীয় জাতের লোকেদের আকৃতিতে ঐ অঞ্চলের জলহাওয়ার প্রভাব সুস্পষ্ট। ফ্রস্ট-বাইট বা তুষার-আক্রমণ থেকে বাঁচবার উপযোগী করে তাদের মুখাবয়ব চ্যাপ্টা-ভাবে গঠিত। চোখের পাতার উপর চর্বির বোঝায় তাদের চোখ প্রায় বুজে থাকে। এতে করে ফ্রস্ট-বাইট থেকে বা সূর্যের প্রখর কিরণ থেকে তাদের চোখ রক্ষা পায় বলে মনে হয়। মুখে দাড়ি-গোঁফের স্বল্পতা থেকে মনে হয়, নিশ্বাসের আর্দ্রতা যাতে দাড়ি গোঁফে না জমতে পারে তারই জন্যে এই ব্যবস্থা। সুদীর্ঘ তুষার-যুগের উপ-যোগী করে এমনিভাবেই এই শ্রেণীর মানুষ গড়ে উঠেছে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে তার তালে তাল মিলিয়ে। সে যুগে এইসব বৈশিষ্ট্য যা তারা একটু একটু করে পেয়েছে, আজ পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে এসেও তাদের সেই বৈশিষ্ট্যগুলি অল্পবিস্তর রয়েই গেছে।

তবে কোন অঞ্চলের স্বাস্থ্যবান লোক অন্য দেশে অন্য ধরনের জলবায়ুতে গিয়েও তাড়াতাড়িই নিজেকে তার উপযোগী করে নিতে পারে। শীতের দেশের লোকের গরম দেশে গিয়ে প্রথম-প্রথম কিছু কষ্ট হয় বটে, তবে খুব বেশি দিন তা থাকে না। কিছুদিনের মধ্যেই সে নতুন দেশের জলহাওয়াতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

তা-ছাড়া আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে নিজেদের উপযোগী আবহাওয়া তৈরি করতেও তো বিশেষ বেগ পেতে হয় না। জুনের দিল্লীকেও এয়ার-কণ্ডিশনার দিয়ে এপ্রিলের ইংল্যাণ্ড বানিয়ে দেওয়া যায় না কি?

জাতি কী?

এতক্ষণ যে আলোচনা হল তার মূল কথা হল তিনটি। এক

মানুষের বংশানুক্রমিক কিছু-কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তা থেকে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। তাদের শারীরিক গঠন ইত্যাদি থেকে শ্রেণী-বিভাগের চেষ্টা এবং প্রতিটি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গবেষণা হয়েছে ও হচ্ছে। দুই, দেহের রঙ বা গঠন ইত্যাদির ব্যাপারে জন্মগত কারণ ছাড়া অন্য কারণও কাজ করে। আর তিন, গায়ের রঙ আর শারীরিক আকৃতিতেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা দৈন্য প্রকাশ পায় না। মানুষের সংস্কৃতিগত উৎকর্ষ অপকর্ষের কারণ খুঁজতে হবে আমাদের অন্যত্র ; যেমন, রেসের ঘোড়া লালই হোক অথবা কালোই হোক দৌড়ানোর ক্ষমতা তাদের গায়ের রঙের উপর নির্ভর করে না। লাল বা কালো রঙের সঙ্গে দৌড়ের কোন সম্পর্কই নেই।

তা-ছাড়া এমনও দেখা যায় যে, সব শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অন্য শ্রেণীর কিছু বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন লোকও রয়েছে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে আকারগত পার্থক্য যেমন আছে, তেমনি এক-এক দেশের লোকের মধ্যে এক-এক ধরনের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, বৈশিষ্ট্যগুলি জন্মগত। তা-ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের মধ্যে সংমিশ্রণ যত হচ্ছে ততই এক অঞ্চলের লোকের মধ্যে অন্য অঞ্চলের লোকের বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমেই ফুটে উঠছে।

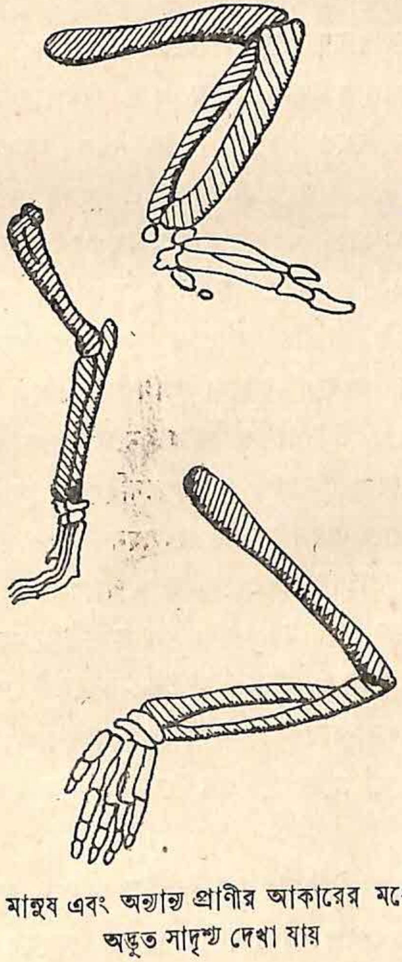
জন্মগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক-একটা মানুষের দল পৃথিবীর এক-একটা অঞ্চলে বহুদিন ধরে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে আসছে। এ-জন্যে সে অঞ্চলের জলহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে কতগুলি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে তারা। এই যে বিভিন্নতা, একেই আমরা জাতি বলে অভিহিত করে থাকি।

বিভিন্ন দেশের মানুষের আকারগত পার্থক্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। এরপরে আমরা মানুষের সংস্কৃতিগত বিভিন্নতা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

৫

বিভিন্ন ধরনের মানুষ

মানুষের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানুষ জাতিকে কতকগুলি শাখা-উপশাখায় ভাগ করার কথা আগেই বলা হয়েছে। তা-ছাড়া দেহগত বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীদের পার্থক্য সম্বন্ধেও অন্যত্র বলা হয়েছে। চুলের গঠন, চোখের রঙ



মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর আকারের মধ্যে
অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়

ইত্যাদি দিয়ে যে প্রধান তিনটি ভাগ করা হয়েছে তার সঙ্গে নৃতত্ত্ববিদেরা আরও একটি ভাগ জুড়ে দিয়েছেন। এ হচ্ছে অস্ট্রেলীয় ধরনের মানুষ, যাদের চুল ইউরোপীয়দের মত কিন্তু নাক নিগ্রোদের মত। সম্ভবত এই শ্রেণীর মানুষ মানব-জাতির ইতিহাসে বহুদিন অন্যান্য দল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। অনেকে মনে করেন, এরা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে আদিম ধারার। এদের মধ্যে পুরুষদের মস্তিষ্ক ধারণের ক্ষমতা গড়ে ১,৩০০ সি. সি. বা ঘন-সেন্টিমিটার—অর্থাৎ সাধারণ আধুনিক মানুষের তুলনায় অনেক কম। এদের মাথার হাড় অনেক শক্ত এবং দাঁতও সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বড়।

গত কয়েক হাজার বছরে মানুষ খাদ্য উৎপাদনের নতুন নতুন পন্থা বের করে নিয়েছে। তার ফলে এক-এক অঞ্চলের অধিবাসীরা সংখ্যায় বেড়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। যেমন মেসোপটেমিয়ায় বা মিশরে, ভারতে বা চীনে একদল মানুষ চাষ-বাস শুরু করেছিল কয়েক হাজার বছর আগে। খাদ্য-সম্ভার প্রচুর থাকাতে কয়েক হাজার বছরের মধ্যে এই জাতীয় লোকের বংশধররা তাদের আশে-পাশে বহুদূর বিস্তৃত হয়ে বসবাস করতে লাগল। আজ তাই ইউরোপ ও এশিয়ায় ককেশীয়, ইউরোপীয় আর মঙ্গোলয়েড ধরনের মানুষের প্রাদুর্ভাব। আবার নিগ্রো বা আমেরিকার আদিবাসীরা খাদ্য-সংগ্রহাদির ব্যাপারে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে নি যার ফলে তাদের জনসংখ্যা তাড়াতাড়ি বেড়ে যেতে পারে।

আরও বিভিন্ন মানুষের দল হল অস্ট্রেলয়েড, বা আফ্রিকার বুশম্যান, যারা এখনও খাদ্য উৎপাদন করতেই শেখে নি। খাদ্য সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করে তাদের জনসংখ্যা নিতান্তই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বেড়ে চলেছে, এবং কোন-কোন ক্ষেত্রে লুপ্তই হতে বসেছে।

এদিকে মানুষের ইতিহাস যত এগিয়ে চলেছে, মানুষের দল যত এ-দেশ থেকে ও-দেশে গিয়ে নানা ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসছে

ততই তাদের নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান হচ্ছে, ততই এক-একটা ছোট গণ্ডীর বাঁধন ভেঙে গিয়ে মিশ্র ধরনের মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। আজকের দিনে বিজ্ঞানের নানা অগ্রগতির জন্যে যখন পৃথিবী অত্যন্ত ছোট হয়ে গেছে তখন তো এ কথা আরও সত্য। জীবতত্ত্বের দিক দিয়ে মানুষের তথাকথিত অসাম্য দূর হয়ে এক মানুষ জাতি গড়বার পথে মানুষ অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে সন্দেহ নেই।

সহজাত বিশেষত্ব

মানুষের চামড়ার রঙ, চুলের গঠন, নাকের উচ্চতা ইত্যাদির সঙ্গে মানুষের চারিত্রিক বিশেষত্বের কোন যোগ আছে কি না এটা এখন ভূতত্ত্ববিদের আলোচনার বিষয় হয়েছে। চলতি ধারণা, যে কোন এক শাখার মানুষ অন্য শাখার মানুষের চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিতে শ্রেষ্ঠ, কোন-কোন জাতের মানুষ অপরাধ-প্রবণ, আবার কোন-কোন জাতের লোকের ভাবপ্রবণতা বেশি, এর মূলে স্বাভাবিক অর্থাৎ সহজাত কোন কারণ আছে কি? এই প্রশ্নই আজকের নৃতত্ত্ববিদকে চিন্তিত করেছে।

প্রত্যেক মানুষের সহজাত কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। মা বাপের কতকগুলি বিশেষত্ব নিয়ে সে জন্মায়, কিন্তু জন্মাবার পর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, বাসস্থান, সামাজিক আচার শৃঙ্খলা ইত্যাদি তাকে গঠিত করতে সাহায্য করে। খাদ্য, রোগ-নিরোধ ইত্যাদি এই বৃদ্ধির জন্যে অনেকখানি দায়ী। একভাবে ক্রমাগত বসে থাকার অভ্যাস করলে হাঁটুর গঠন এক বিশেষ ধরনের হতে পারে, নাপিতের সাহায্যে সোজা চুলেও ঢেউ-খেলানো যায় বটে, কিন্তু চোখের রঙ বদলানো যায় না। মানুষের আসল শারীরিক গঠনের মূলে তাই বংশ, বাসস্থান, সমাজ ও সংস্কৃতিগত কারণগুলি বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। তবে এই কারণগুলি ঠিক কোন্‌টা কতটা কাজ করে, তা ঠিক করে এখনও নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি।

তবে জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা, যে এক দেশ বা এক জাতের বাপ মা যেখানে যখনই থাকুক না কেন তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে চারিত্রিক, এমনকি দৈহিক কোনও পরিবর্তন হবে না, এ কথাটা আসলে হয়ত ঠিক নয়। জাপানের সাধারণ লোকের দৈর্ঘ্য কম। কিন্তু জাপান থেকে আমেরিকার স্থান-বিশেষে যে-সব জাপানী গিয়ে কিছুদিন ধরে বসবাস করেছে তাদের সন্তান-সন্ততির দৈর্ঘ্য অনেক বেশি হতে দেখা গিয়েছে।

মানব-সন্তানের মানসিক ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ণয় করবার জন্যে যে-সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-প্রণালী প্রচলিত আছে তাতে দেখা যায়, এক-একটি শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এক-এক ধরনের পরীক্ষায় এক-এক রকমের ফল দেখায়। কেউ সঙ্গীতে পটু, কেউ গণিতে, কেউ খুব সপ্রতিভ, কেউ আবার লাজুক, মুখচোরা। সৌন্দর্য সম্পর্কে কারও কারও বোধ আশ্চর্য রকমের, আবার কারও কারও অত্যন্ত কম।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও মানসিক বৈচিত্র্য

মানুষের আবয়বিক বৈচিত্র্যগুলির সঙ্গে মানসিক বৃত্তিগুলির সমন্বয় করবার সময় নৃতত্ত্ববিদ মনস্তত্ত্ববিদের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হন যে, মানুষের মানসিক ক্ষমতার পেছনেও তার বংশগত কারণ বেশ খানিকটা কাজ করে। এর সঙ্গে সংস্কৃতিগত কারণ, অর্থাৎ পরিবেশ, সামাজিক আচার ব্যবহার ইত্যাদিও এই বৃত্তিগুলির প্রসারের জন্যে দায়ী হয়ে থাকে। দেহগত বৃত্তিগুলির মত মানসিক বৃত্তিগুলিরও ইতর-বিশেষ হয়ে থাকে দেশ, কাল, পরিবেশ হিসেবে।

আজকের দিনেও এক একটি আঞ্চলিক গোষ্ঠী বা জাতির লোকের মধ্যে কতকগুলি এক ধরনের মানসিক বৃত্তি দেখা যায়। কোন জাতির লোকের সাংস্কৃতিক পরিবেশে তাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা প্রতিফলিত হয়; কেউ কেউ হয় অত্যন্ত শ্রমশীল, কেউ কেউ কিছুটা বেশি ভাবপ্রবণ। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ এখনও পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তই করেন

যে, বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে এই ধরনের সমষ্টিগত ঐক্য তাদের প্রত্যেকটি লোকের বংশগত কারণে হয় না। এর মূলে আছে সে গোষ্ঠীর আদর্শ, তার জীবন-দর্শন, তার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ। এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি গোষ্ঠীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় এবং এর থেকেই হয় তাদের পরিচয়। তবে কেউ যদি বলেন যে পশ্চিমী সভ্যতার মূলে রয়েছে ককেশয়েড রক্ত, বা চীনা সংস্কৃতি বংশগত জীবনধারা থেকে উদ্ভূত, তাহলে তিনি বিজ্ঞান ও ইতিহাসের অনেকটাই অস্বীকার করবেন। আর এ ধরনের ধারণা যদি রাষ্ট্রের ক্ষমতাবান লোকের মাথায় ঢুকে তাকে রাষ্ট্রগঠনের কাজে প্রভাবিত করে তবে তা বড় রকমের বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। বিংশ শতাব্দীতে 'নর্দিক' বা 'আর্য' জাতির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে মাতামাতির ইতিহাস অনেকেরই হয়ত জানা আছে। এক কথায় বলা যায় যে, বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটি কারণই হল এই ধরনের মতবাদ।

৬

আদিম কালে মানুষের দিনচর্চা

প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করা, আহার সংগ্রহ করা ও আত্মরক্ষার উপযোগী শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমবিবর্তনে হারিয়ে সেকালের মানুষ যখন আধুনিক মানুষের রূপ পেতে শুরু করল তখনই সে পৃথিবীর গহনে কন্দরে রাখতে আরম্ভ করল তার জীবন-ইতিহাসের নানা উপাদান। খাবার জন্যে তার পশুর মাংস চাই। পশু শিকার করবার জন্যে অস্ত্র চাই, সেটা যদি ধারালো হয় তবে পশু বধ করা আরও সহজ হয়। শীত নিবারণ করতে পশুর চামড়া বেশ কাজ দেয়, তা কাটা-ছেঁড়া করতে ছুরি-জাতীয় কোন ধারালো জিনিস দরকার। পশুর চামড়া দিয়ে আশ্রয় তৈরি করে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা থেকে আত্মরক্ষা করা যেতে পারে। এই সমস্ত কাজ করবার জন্যে যে-সব জিনিস মানুষ ব্যবহার করেছে আদিম মানুষের বাসস্থানের কাছে তা পাওয়া গেছে, আর তা থেকেই তৈরি হয়েছে আদিম মানুষের ইতিহাস।

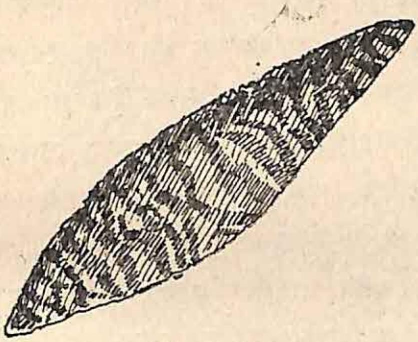
আজ প্রত্নতত্ত্ববিদরা মানুষের জীবন-যাত্রার উপযোগী এ-রকম বহু জিনিস আবিষ্কার করেছেন। এ সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র এবং অন্যান্য উপাদানের আবার রকম-ভেদও দেখা গিয়েছে যা থেকে বোঝা যায়, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের অস্ত্র-শস্ত্রের আকার, প্রকার ও উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে। অথচ এ-সব তৈরি করবার উপাদানের প্রকৃতি-ভেদে অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদির চেহারা বদলে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে মানুষের জীবন-যাত্রার পদ্ধতি। এই হাতিয়ার তৈরির উপাদান থেকেই বিজ্ঞানীরা মানুষের প্রাগৈতিহাসিক কালকে ভাগ করেছেন পুরা-প্রস্তর যুগ, নব্য-প্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ইত্যাদিতে।

একেবারে প্রথম যুগের অস্ত্র বোধহয় গাছের ডালের টুকরো,

হাড়, পাথর বা নুড়ি। হাত দিয়ে ভাল করে ধরবার জন্যে কখনও-কখনও হয়ত এদের ঘসে বা চিরে নেওয়া হত। কাঠের



পাথুরে কুঠার
(নব্য-প্রস্তর যুগ)



পাথুরে কুঠার
(শেষ-প্রস্তর যুগ)



পাথুরে ছুরি

হাতিয়ার লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রথম যুগের ভাঙা পাথরও প্রাকৃতিক কারণে অর্থাৎ বেশি গরমে বা খুব ঠাণ্ডায় ভাঙা পাথরের টুকরো থেকে আলাদা করা যায় না। তবে সেকালের মানুষ সম্পূর্ণ পরিণত মানুষ হবার আগে থেকেই পাথর চিরে অস্ত্র বানাতে শিখেছে। মানুষের প্রথম ব্যবহৃত পাথুরে অস্ত্রের নাম দেওয়া হয়েছে 'ইয়োলিথ'।

পাথর আর আগুন

প্লাইস্টোসিন যুগের শুরুতেই সে-সময়কার মানুষ বেশ দক্ষভাবে পাথরের অস্ত্র বানাতো। তারা আগুনেরও ব্যবহার জানত। চীনের

পিকিং শহরের কাছে পৌ-কু-টিয়েন-এর গিরিগুহায় পিকিং মানুষের কঙ্কালের ফসিলের সঙ্গে পাওয়া গেছে বহুদিন আগে লুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণীর ফসিল। পাওয়া গেছে পাথর থেকে খণ্ড করে তৈরি করা অস্ত্র আর হাড়ের টুকরো, যাতে নিশ্চয়ই আগুনের তাপ লাগানো হয়েছিল।

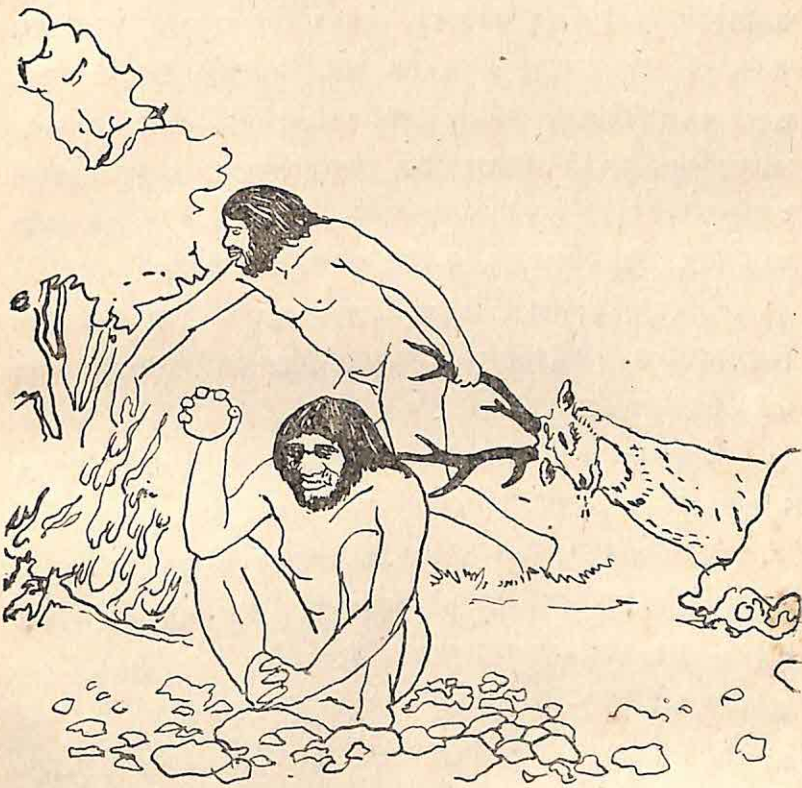
পাথর দিয়েই সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র তৈরি করা যায়—আদিম মানুষ তার অভিজ্ঞতা থেকেই এ তথ্য আবিষ্কার করেছিল। তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বের করেছিল কিভাবে পাথর ভালভাবে কেটে অস্ত্র বানানো যায়। পাথরের টুকরো থেকে চপার বা কোপানোর অস্ত্র, করাত, তুরপুন, ছুরি অথবা স্ক্রেপার বা ছাড়ানোর অস্ত্র বানানো হত। পাথর থেকে নানারকম অস্ত্র বানানো সম্বন্ধে রীতিমত একটা বিজ্ঞান গড়ে উঠেছিল। পাথরের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই জ্ঞান যখন মানুষের আয়ত্তে এসেছিল তখনই মানুষ অস্ত্র তৈরির ব্যাপারে বিশেষ দক্ষ হতে পেরেছিল।

আগুনের ব্যবহার

আগুনকে কাজে লাগিয়েই মানুষ জীবন-যাত্রায় এক বিপ্লব এনেছে, এ-কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। এই আগুন দিয়ে আদিম মানুষ শীত তাড়িয়েছে, যার ফলে তাদের পক্ষে শীতের দেশে বাস করা সহজ হয়েছে। তা-ছাড়া আগুন বন্য পশুদের তাড়িয়ে তাদের আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করেছে। এক কথায়, আগুনকে কাজে লাগিয়ে মানুষ প্রকৃতির দাসত্ব থেকে অনেকাংশে মুক্তি পেয়েছে। প্রকৃতির এক সৃষ্টি মানুষ প্রকৃতির আর এক শক্তি অগ্নিকে নিজের কাজে লাগাচ্ছে। ভবিষ্যতের ইতিহাসে এ যে কত বড় ব্যাপার তা বলে শেষ করা যায় না। মানুষের ইতিহাসে যত আবিষ্কার, যত কীর্তি, যা-কিছু অসাধ্য সাধন এ সকলের মূলে রয়েছে আগুনের উপর তার ক্ষমতা বিস্তার। আজকের রকেট, স্পেস-শিপ

কোন কিছুই হয়ত সম্ভব হত না সেদিনকার সেই মানুষ যদি আগুনের ব্যবহার আয়ত্ত না করতে পারত।

ঠিক কবে যে মানুষ আগুন আবিষ্কার করল তা বলা যায় না। তবে, আদিম মানুষ বোধহয় চকমকি ঠুকে আগুন বের



সেকালের গুহাবাসী মানুষের ঘর-সংসার

করত, যেমন এ-কালে বন্য জাতিরা আজও করে থাকে। তবে, কাঠে কাঠে ঘসে আগুন জ্বালানোর কায়দা মানুষ আরো পরে আয়ত্ত করেছে মনে হয়।

আদিম মানুষের খাদ্য

প্লাইস্টোসিনের শুরুতে মানুষের খাদ্য মোটামুটি ধরে নেওয়া

যায় বুনো ফল, শিকার-করা প্রাণী বা পাখির মাংস, ডিম, টিকটিকি আর মাটি-খুঁড়ে-বের-করা কন্দমূল-জাতীয় জিনিস। মানুষ বাস করত পাহাড়ের গুহায় অথবা গাছের ডালপালা দিয়ে আশ্রয় তৈরি করে। শিকার করবার জন্যে পশুদের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করা দরকার। এই গতিবিধি লক্ষ্য করে যে অভিজ্ঞতা তাদের হত তা থেকে তারা সকলেই উপকৃত হত। শুধু পশুপাখির প্রকৃতি নয়, শিকার এবং খাদ্য সংগ্রহের জন্যে তাদের দিন-ক্ষণ এবং প্রাকৃতিক আবহাওয়ারও খেয়াল রাখতে হত। তা-ছাড়া পাথর এবং পাথর থেকে তৈরি অস্ত্রের কথা তাদের যে চিন্তা করতে হত সে-কথা আগেই বলা হয়েছে।

এই যে চিন্তাধারা, এ-ই তো বিজ্ঞানের জনক। আজকে ধাতু-বিদ্যা, পূর্তবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা বা অন্যান্য বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন তো এই দলগত অভিজ্ঞতা থেকেই শুরু হয়েছে।

সমাজ-ব্যবস্থার প্রসারও এই সময় থেকে। প্রাণী হিসেবে মানুষ অন্যান্য পশুপ্রাণীর চেয়ে দুর্বল এবং আহার সংগ্রহ এবং আত্মরক্ষার জন্যে তাদের প্রত্যেককে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। তাই এই সময় থেকেই পরিবারের চেয়ে বড় সামাজিক সঙ্ঘের উদ্ভব হয় বলে অনেকে মনে করেন।

দু-রকম হাতিয়ার-শিল্প

প্লাইস্টোসিন যুগে ইউরোপ অন্তত চার বার তুষারে ঢেকে গিয়েছে। উত্তর ভারতেও হিমের আক্রমণ হয়েছে। শেষ বারের হিমের আক্রমণ পর্যন্ত মানুষের হাতিয়ার তৈরি চলতে থাকে আগে যে-ভাবে বলা হয়েছে ঠিক সে-ভাবেই। তবে, দুই অঞ্চলে দু-রকমের হাতিয়ার-শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। দুই বিভিন্ন দলের মানুষ পাথর থেকে দুই বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার তৈরি করছিল। একরকম হাতিয়ার বড় পাথর ফাটিয়ে তা থেকে প্রয়োজন-উপযোগী পাত বের করে তা ঘসে-মেজে বানানো হত।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এর নাম দিয়েছেন ফ্লেক বা পাত-শিল্প। আরও একরকম ভাবে পাথর থেকে অস্ত্র তৈরি করা হত। তা হল এক টুকরো পাথরই কেটে-কুটে ব্যবহারের উপযোগী করে অস্ত্রে পরিণত করা। একে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন কোর-শিল্প।

এই দুই ধরনের হাতিয়ার-শিল্পের নিদর্শন পৃথিবীর দুটি আলাদা অঞ্চলে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। ফ্লেক বা পাত-শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তর দিকে, অর্থাৎ আল্প্স্, বলকান্স্ ককেশাস, হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্বতমালার উত্তর দিকে। পাত-শিল্পের সঙ্গে যে-ধরনের মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে তা আজকের মানুষের কঙ্কালের মত নয়। কোর-শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে দক্ষিণ ভারতে, সিরিয়ায়, প্যালেস্টাইনে, সারা আফ্রিকায় এবং ইউরোপের স্পেন, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে। এ-সমস্ত অস্ত্রের নির্মাতা মনে হয় 'হোমো স্যাপিয়েন্স্' নামে একজাতের মানুষ, এই মানুষরাই হল গিয়ে আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ।

তবে অনেকে মনে করেন যে, এই দুই জাতির মানুষের মধ্যে সংমিশ্রণ হয়েছিল। অন্তত এই দুই বিভিন্ন শিল্পীদলের লোকেরা যে কাছাকাছি বাস করত, তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। মনে হয় আবহাওয়ার পরিবর্তনে যখন হিমের আক্রমণ চলছিল তখন এই পাত-শিল্পী মানুষের দল ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সিরিয়া, এমনকি আফ্রিকাতেও ছড়িয়ে পড়ে। একই সময়ে কোর-শিল্পী মানুষেরা দক্ষিণে সরে যায়। আবার যখন আবহাওয়া অনুকূল হয়ে ওঠে তখন তারা উত্তরে ফিরে আসে। এমনি করে স্থানান্তর হওয়াতে দু-জাতের শিল্পীরা হয়ত একে অন্যের কাছাকাছি এসে পড়েছিল বলে।

মুস্টেরিয়ান

প্রায় ৫০,০০০ বছর আগে যখন শেষ তুষার-যুগের শুরু হয় তখন ইউরোপে একদল নতুন মানুষের আবির্ভাব ঘটে। তাদের

নাম দেওয়া হয়েছে 'মুস্‌টেরিয়ান' (mousterian)। প্রচণ্ড শীত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে তারা গুহায় বাস করত। তাদের বাসস্থান এবং অন্যান্য জিনিস থেকে তাদের সম্বন্ধে বিশদভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। এত খবর বোধহয় আদিম যুগের আর কোন মানবগোষ্ঠী সম্বন্ধে জানা যায় নি।

মুস্‌টেরিয়ানরা ছিল ফ্লেক-শিল্পী, এরা নিয়েনডারথাল মানুষের বংশের। এরা হাঁটত একটু টলমল করে। মাথাও একেবারে সোজা করে দাঁড়াত না। এদের ভ্রূর হাড় ছিল উঁচু আর চোয়াল বড়—থুতনিবিহীন। এরা দেখতে খানিকটা বনমানুষের মত ছিল। তবে এরা কিছু-কিছু কথা বলতে পারত। দল বেঁধে শিকার করত এরা। মুস্‌টেরিয়ানদের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব এই যে, এরা এদের মৃতদেহ যত্ন করে কবর দিত। এই অনুষ্ঠান ছিল বলে অনেকগুলি নিয়েনডারথাল মানুষের কঙ্কাল তাদের বাসস্থানের কাছে পাওয়া গিয়েছে। কবরের মধ্যে মৃতদেহগুলির মাথার নিচে একটি করে পাথরের বালিশ দেওয়া হত। কবরগুলির কাছে চুলো দেখে মনে হয় যে দেহ গরম রাখবার জন্যেই এ-রকম বন্দোবস্ত। মৃতদেহের কাছে অস্ত্র-শস্ত্র আর পশু-মাংসের হাড় দেখে মনে হয়, এরা খাদ্য এবং অস্ত্র মৃতদেহের সঙ্গে দিয়ে দিত। হয়ত মৃত্যুর পরের জীবনে এদের বিশ্বাস ছিল—যে বিশ্বাস হাজার হাজার বছর পরেও আজকের দিনের সভ্য মানুষের মধ্যে চলে এসেছে। মৃতের কাছে আগুন রাখার প্রথা আজ পর্যন্ত সভ্য মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এর মধ্যে কোন জাদুর ব্যাপার ছিল কি না কে বলতে পারে।

আজকালকার মানুষের আবির্ভাব

এই নিয়েনডারথাল মানুষও একদিন লুপ্ত হয়ে গেল। তারপর কেটে গেল কয়েক হাজার বছর। তার জায়গায় এল আমাদের

মতন মানুষ, অর্থাৎ যে মানুষ এল তার কঙ্কাল এখনকার মানুষের কঙ্কাল থেকে বেশি তফাত নয়। এই ধরনের মানুষের কঙ্কাল যা ইউরোপে পাওয়া গিয়েছে তা চারটি বিভিন্ন জাতির বলে চেনা গিয়েছে। সাইবেরিয়াতে ছোট ছোট মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, তাতে তিনটি প্রধান জাতির চুলের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এদের হাতের কাজ, পাথরের অস্ত্র,কারুশিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের এবং প্রত্যেকটি নিজ-নিজ গোষ্ঠীর বা জাতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দেয়। এই বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর মধ্যে কোন সম্পর্ক টেনে আনা যায় না।

পুরাতত্ত্ববিদরা এই শিল্পগুলিকে পুরা প্রস্তরযুগীয় বলে অভিহিত করেন। ইউরোপে এই শিল্পের কয়েকটি ধারার নাম প্রেডমোস্‌টিয়ান, অরিনেশিয়ান এবং মদ্‌লিনিয়ান। প্রেডমোস্‌টিয়ান ধারাটি পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের, আর অরিনেসিয়ান এবং মদ্‌লিনিয়ান নাম-দুটি এসেছে ফরাসী দেশের দুটি জায়গার নাম থেকে। এই শিল্পীরা অস্ত্র তৈরির যন্ত্রপাতি তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিল। হাড়, হাতির দাঁত আর ফ্লিণ্ট পাথর থেকে তারা নানা বিশেষ ধরনের অস্ত্র তৈরি করত। এমনকি তারা তীর ধনুক বা বল্লম ছোঁড়ার যন্ত্রও আবিষ্কার করেছিল। এই আবিষ্কার থেকে শুধু যে তাদের কর্মদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তা নয়, এ থেকে প্রমাণ হয় যে, তৎকালীন মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারে আরও অনেক তথ্য জমা হয়ে গিয়েছিল। তা-ছাড়া বিজ্ঞানের প্রয়োগও বেশ ভালভাবেই হয়ে চলেছিল সে-যুগে।

মোরাভিয়াতে প্রেডমোস্ট নামক জায়গার ঝুরো মাটির স্তরের নিচে হাজার-খানেক ম্যামথের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এর মাংস প্রেড-মোস্‌টিয়ান শিকারীরা তাদের দলের লোকদের জন্যে সংগ্রহ করেছিল। তারা জানত, প্রতি বছর শীতকালে সাইবেরিয়া আর রাশিয়া থেকে দানিয়ুব উপত্যকায় রাশি রাশি ম্যামথ, বল্গা হরিণ, বাইসন, বন্য ঘোড়া প্রভৃতি ঘাস খেতে আসে। তারা এদের আসার পথে পাহাড়ের

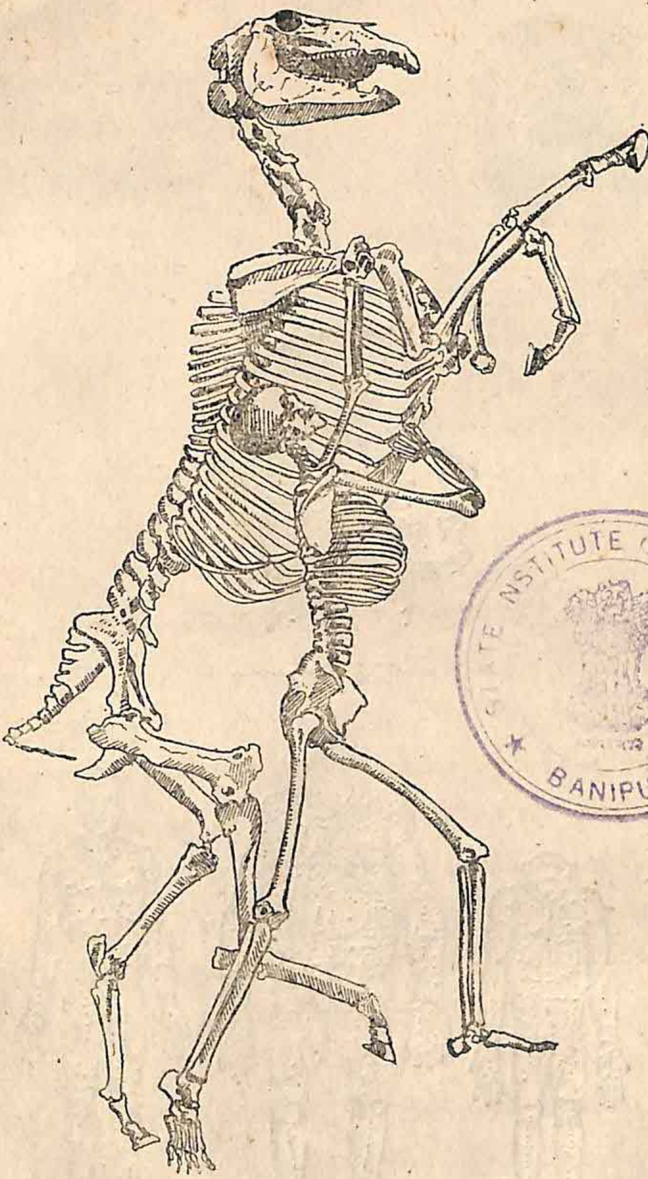
গিরিবর্ত্মে দল বেঁধে থেকে এদের শিকার করত। রাশিয়ান প্রত্নতত্ত্ব-বিদরা এইসব মানুষের বাসস্থান খুঁড়ে বের করেছেন; সে বাসস্থান-গুলি খানিকটা মাটির নিচে মজবুত করে তৈরি করা হয়েছিল।

অরিনেশিয়ান এবং তাদের পরবর্তী যুগে মদ্‌লিনিয়ানরা মধ্য-ফ্রান্সে আরও অনুকূল অবস্থায় বেড়ে উঠেছিল। সেখানে ছিল বিরাট ঘাসের বন, আর তার মধ্যে চরে বেড়াত ম্যামথ, বাইসন, বল্গা হরিণ, গরু ও ঘোড়া। ডরডোঁ আর ভের্জর নদীতে মাছেরও ছড়াছড়ি। চুনা পাথরে তৈরি পাহাড়ের গুহাগুলি বাসের পক্ষে বেশ আরামের। এখানে এই প্রচুর খাদ্য পেয়ে অরিনেশিয়ান আর মদ্‌লিনিয়ানরা স্বচ্ছন্দে বেড়ে উঠল। তাদের লোকসংখ্যা যে খুবই বেড়ে গিয়েছিল তা বোঝা যায় এখানে পাওয়া অসংখ্য কঙ্কাল থেকে।

অরিনেশিয়ানদের সংস্কৃতি মানুষের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে তারা কিছু জ্ঞান উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছিল। তীর-ধনুক আর বল্লম ছোঁড়ার ব্যাপারে তারা ছিল অগ্রণী। বল্লম ছোঁড়ার সময় দরকার হয় হাতের মাংসপেশীর জোর। এ কাজটাকে সহজ করার জন্যে এরা এক ধরনের যান্ত্রিক উপায় আবিষ্কার করেছিল। তা-ছাড়া ধনুকের সাহায্য নিয়ে তীর ছোঁড়ার উপায়ও এরাই আবিষ্কার করেছিল। আজও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা এবং এস্কিমোরা বল্লম ছোঁড়ার যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে।

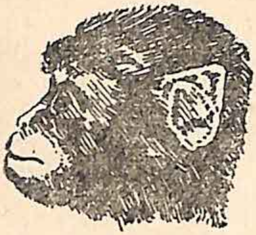
এই গোষ্ঠীর মানুষ অনেকে দল বেঁধে বাস করত। কারণ তা না হলে ম্যামথ-বাইসনের মত বড় শিকার, যার জন্যে প্রয়োজন হয় একগাদা লোকের, তা সম্ভব হত না। তবে, তাদের সমাজ-ব্যবস্থা কিরকম ছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

বাসস্থান ছেড়ে একটু-আধটু অন্য দেশের সঙ্গে ওদের কাজকর্ম ছিল কি না সে-কথাও সঠিক করে বলা যায় না। অবশ্য মধ্য-ফ্রান্সে অবস্থিত এদের বাসস্থানের কাছে ভূমধ্যসাগরের ঝিনুক

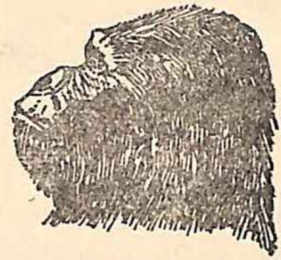


STATE INSTITUTE OF EDUCATION
BANIPUR

মানুষ আর ঘোড়ার কঙ্কাল। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মানুষই কেবল পুরোপুরি সোজা হয়ে দাঁড়ায় ; ঘোড়া, গরু প্রভৃতির মেরুদণ্ড সামনে এবং পেছনে পায়ের মধ্যে সেতুর কাজ করে। (পৃঃ ১৮)



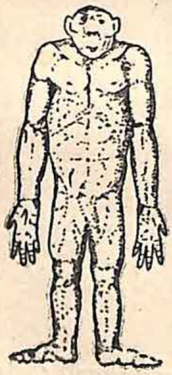
বানরের মুখ



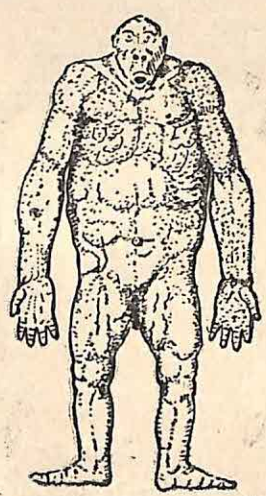
গরিলার মুখ



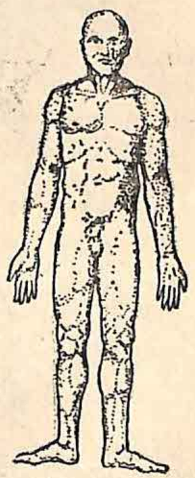
আধুনিক মানুষের মুখ



শিম্পাঞ্জি



গরিলা



আধুনিক মানুষ

পাওয়া গেছে। মধ্য-ফ্রান্সে অবস্থিত এদের বাসস্থানের কাছে ভূমধ্য-সাগরের ঝিনুক এল কী করে? ব্যাপারটা নৃতত্ত্ববিদের কাছে রীতিমত ভাববার বিষয় বইকি!

চাষ-বাস করে খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধেও এদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। খাদ্য এবং পশু সংরক্ষণ-চেষ্টার প্রমাণ আজকালকার বন্য জাতিদের মধ্যে দেখা যায়। মধ্য-ফ্রান্সের অধিবাসী এই মানুষদের অত্যধিক শিকারের ফলেই বোধহয় ম্যামথ লোপ পেয়ে গেছে।

৭

আদিম মানুষের শিল্পচর্চা

অরিনেশিয়ান মানুষের শিকারের কথা আগেই বলেছি। বাইসন আর ম্যামথ ছিল এদের প্রিয় খাদ্য। তাই এদের চিন্তারও অনেকখানি এই পশুগুলিকে কেন্দ্র করে থাকত।

এই শিকারী মানুষগুলির জীবনযাত্রার একটা দিক সত্যিই ছিল অদ্ভুত। এদের মধ্যে এমন এমন দক্ষ ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী ছিল যাদের হাতের কাজ আজও শিল্পরসিক ও নৃতত্ত্ববিদের বিস্ময় জাগায়। পাথর, হাতির দাঁত ও মাটি দিয়ে এদের বানানো মানুষ ও পশুর মূর্তি এদের বাসস্থানের কাছ থেকে উদ্ধার করা গিয়েছে। এরা যেখানে থাকত সেখানকার গুহাগুলির দেয়ালে এদের আঁকা বহু ছবি থেকে এদের জীবনযাত্রার একটা চিত্র আমাদের কাছে ধরা পড়ে। চিত্র-সমালোচকদের মতে ছবিগুলির শিল্প-মূল্য অসামান্য। ফরাসী দেশের গুহাগুলিতে আঁকা ছবিগুলি লক্ষ্য করে দেখলে ছবি আঁকার ব্যাপারে এদের উন্নতির স্তরগুলি চোখে পড়ে। প্রথম দিকের আঁকা ছবিগুলি কাদার উপরে আঙুল দিয়ে আঁকা ছবির বহিঃরেখা। কোন-কোন জায়গায় ছবিগুলি পাথরের উপর পাথর দিয়ে ক্ষোদাই করা। কোন-কোন জায়গায় আবার কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা। ছবিগুলো প্রথম-প্রথম শুধু পশুর মুখের রেখাচিত্র; পার্সপেকটিভ-এর কোন চেষ্টাই নেই—ছবিতেও মূল বস্তু ছাড়া অন্য সব জিনিসের কোন দেখা নেই।

সবচেয়ে পুরোনো শিল্প-নিদর্শন যা আবিষ্কার হয়েছে তা কতকগুলি ছোট-ছোট মানুষের মূর্তি, পাথরের বা হাতির দাঁতের তৈরি। হাত, পা, বুক, পেট সবই গোল-গোল। মুখ বলে কিছু নেই, অর্থাৎ নাক, মুখ, চোখ ইত্যাদি সবই দেখানো হয়েছে একটা গোল মুণ্ডু বানিয়ে।

অবশ্য শরীরের কোন-কোন বিশেষ অংশ বেশ বড় করে দেখানো হয়েছে।

এ-রকম মূর্তি শুধু যে ফরাসী দেশেই আবিষ্কৃত হয়েছে তা নয়, ইউরোপের অন্যান্য জায়গায়ও এরকম মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। দানিয়ুবের ধারে ওয়ালডর্ফ বলে একটি জায়গার কাছে চুনাপাথরের একটি মূর্তি আবিষ্কার করেছেন প্রফেসর ওবারমেয়ার। শিল্পকলার জগতে এটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।

ওয়ালডর্ফের ভিনাস

মূর্তিটি দেখে চেনা যায়, এটি একটি নারীমূর্তি। লম্বায় ১৩৫ মিলিমিটার অর্থাৎ প্রায় ছ-ইঞ্চি। মূর্তিটি বেশ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। এর সবগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই বেশ ভালভাবে বোঝা যায়। এ-যুগের অন্যান্য মূর্তিগুলির মতই এর মুখচোখের দিকে শিল্পীর লক্ষ্য ছিল না। মাথার চুলগুলি কিন্তু বেশ পরিপাটি করে দেখানো আছে—বেশ কোঁকড়া-কোঁকড়া, সুসংস্কৃত। শরীরের কোন-কোন অঙ্গ বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে। বোধহয় সে যুগের নারীর সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে একে তৈরি করা হয়েছিল। এর নাম তাই দেওয়া হয়েছে ওয়ালডর্ফের ভিনাস (ভিনাস অব্ ওয়ালডর্ফ)। এর হাতে কঙ্কনের মত একটা কিছুও দেখা যায়। অলঙ্কারের প্রচলন বোধহয় এ-সময়ে হয়েছে। মেয়েদের সাজগোজ বেশ উঁচু স্তরে পৌছেছিল মনে হয়। একটি অরিনেশিয়ান কঙ্কালের কাছে লাল রঙ পাওয়া গিয়েছে। মনে হয় এ রঙ সাজগোজের জন্যে ব্যবহার করা হত।

পশুদের ছবির প্রাচুর্য পাওয়া যায় এর পরের যুগের শিল্পীদের কাজে মদলিনিয়ান যুগে। এ-যুগের শিল্পীরা আর গোল-গোল করে মূর্তি গড়ত না। তাদের কাজের মধ্যে আকৃতিকে যথাযথভাবে দেখানোর প্রচেষ্টা বেশি করে দেখা যায়। মঁটে পাসাঁর গুহায় একটা

সিংহের প্রতিমূর্তি আছে। এটি কাদার উপরে রিলীফ পদ্ধতিতে আঁকা। প্রতিমূর্তিটা ১৬০ সেন্টিমিটার লম্বা আর ৭০ সেন্টিমিটার উঁচু। অদ্ভূত জীবন্ত প্রতিমূর্তি; এমনভাবে এটি তৈরি যে মনে হয় যেন গুহার দিকে এগিয়ে আসছে।

মোটামুটি পুরা-প্রস্তর যুগের এই ধরনের শিল্পের তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম যুগে প্রতিমূর্তিগুলি পাহাড়ের গুহায় নরম কাদার উপরে আঙুল দিয়ে আঁকা। নানা পশুর আকারের একটা মোটামুটি ছবি এগুলি। চারদিক কালো, হলদে বা লাল রঙের রেখাচিত্র।

এর পরের স্তরে যে ছবিগুলি দেখা যায় তাতে পশু প্রাণীর চেহারা আরো যথাযথভাবে আঁকা বা খোদাই করা। যা ম্যামথের ছবি,আকারে প্রকারে,অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ম্যামথেরই প্রতিকৃতি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরস্পরের সম্বন্ধ বা তাদের অবস্থান নিপুণভাবেই দেখানো হয়েছে।

তৃতীয় স্তরের চিত্রগুলিতে এ ছাড়াও রঙের শেড দিয়ে ছবিকে ড্রয়িং থেকে পুরোপুরি রঙিন চিত্রের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ সময়কার একটি বিখ্যাত ছবি 'বাইসন' অথবা আলটমিরা গুহার 'দৌড়নো ঘোড়া' গতিভঙ্গিতে আধুনিক চিত্রশিল্পী এবং শিল্পরসিকেরও বিস্ময় জাগায়।

পূর্ব-স্পেনে পাওয়া এ যুগের ছবি থেকে পুরা প্রস্তরযুগের মানুষের জীবনের একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। যুদ্ধের একটা ছবি আঁকা আছে যা গতির বর্ণনায় অসামান্য। সৌন্দর্যের দিক দিয়ে বিচার করলে হয়ত এ ছবি বিশেষ মূল্য পাবে না, কিন্তু ছবিতে সমকালীন ঘটনার বর্ণনা ও শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিখুঁতভাবে ধরা রয়েছে।

শিল্প উদ্দেশ্যমূলক

প্রশ্ন জাগে, এই যে প্রাচীন শিল্পকলা,এ কি শুধু চিত্রশিল্পীর খেয়ালের ফল? এ-কথা হয়ত ঠিক যে সেকালকার শিল্পী ছবি এঁকে বা ক্ষোদাই করেই আনন্দ উপলব্ধি করতেন, যেমন চিরকালের শিল্পীরা করে

থাকেন। কিন্তু যেভাবে এবং যে-সব অগম্য জায়গায় ছবিগুলি আঁকা রয়েছে তা দেখে মনে হয়, নিছক আঁকার প্রেরণা ছাড়া অন্য কোন প্রেরণাও ছিল এর পেছনে, যাতে করে শিল্পীকে এতখানি মেহনত করতে হয়েছে। যে-সব জায়গায় এ ছবিগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি চুনা-পাথরের গুহার গহন কোণে, যেখানে দিনের আলো কখনও পৌঁছয় না। এ-সব যায়গায় ঢোকাই অত্যন্ত কষ্ট-সাধ্য। অনেক ছবি আঁকতে চিত্রকরকে কষ্টকর ভঙ্গীতে চিত হয়ে শুয়ে অথবা অপরের কাঁধে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়েছে। জন্তুর চর্বিতে শেওলা ডুবিয়ে তার প্রদীপ জ্বেলে দিনের পর দিন এভাবে কাজ করতে হয়েছে। ছবিগুলি আঁকবার সময় যাতে সেগুলি জীবন্ত আর যথাযথ আকৃতির হয় তার জন্যে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। ছোট-ছোট পাথরের ব্লকে আগে ছবিটিকে এঁকে নিয়ে তারপর গুহার গায়ে সেটাকে বড় করে আঁকা হয়েছে।

এ থেকে মনে হয়, এই ছবি আঁকার পেছনে একটা কোন জাদুর উদ্দেশ্য ছিল। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা আজও যে-সব পাখির মাংস খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে সে-সব পাখির বংশবৃদ্ধি করবার উদ্দেশ্যে জাদু-প্রক্রিয়া করে থাকে। পুরাকালের শিকারীরাও খাদ্য-পশুর বংশবৃদ্ধির জন্যে এ-রকম জাদু-প্রক্রিয়া করত বলে মনে হয়। অনেকগুলি ছবি দেখা যায় হরিণ বা বাইসনের প্রতিকৃতিতে তীরবিদ্ধ অবস্থায় আঁকা। এ দেখে মনে হয় শিকারের আগে কোন জাদুর সাহায্য নেওয়া হয়েছে যাতে করে শিকারে অসাফল্য না আসে।

শিল্প-সাধনা

মোট কথা, এই ধরনের শিল্পী রীতিমত সাধনার ফল। ছোট-ছোট পাথরে আঁকা নমুনা ছবিগুলি থেকে মনে হয় সেগুলি যেন শিল্পীর কাজ শেখা বা অনুকরণ করার জন্যেই তৈরি। এদের কোন কোনটাকে আবার শিক্ষক-জাতীয় কেউ সংশোধনও করে দিয়েছে।

দেখা যায় এই শিল্পীরা সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকত। এদের খাতির ছিল প্রচুর। তবে, তারা যে শুধু তাদের চিত্রকলা নিয়ে থাকত সে-রকম মনে হয় না। কারণ পশুদের নানা-রকম স্বাভাবিক ভঙ্গীতে যে-রকমভাবে ছবি আঁকা হয়েছে তা পশুদের গতিবিধির সঙ্গে সম্যক পরিচয় না থাকলে সম্ভব নয়। আর পশুদের গতিবিধির সম্যক পরিচয় শিকারীর মত আর কার থাকতে পারে?

সে-যুগের শিল্পের একটা বিশেষ দিক হচ্ছে, এ থেকে সেকালের জীবজন্তু, বিশেষ করে যে-সব পশুর মাংস খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় সে-সব পশু সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করি। ছবিগুলি দেখে হরিণ বা অন্যান্য প্রাণীর প্রজাতিগুলি পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানা যায়। পুরা-কালের শিকারীর প্রাণীদের শারীর-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে বেশ ভাল ধারণা ছিল তাও বেশ বোঝা যায়। তা ছাড়া শরীরে হৃৎপিণ্ডের গুরুত্ব এবং তার অবস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান তীরবিদ্ধ পশুর ছবি থেকেই বোঝা যায়। একটা আহত বাইসনের ছবিও পাওয়া গিয়েছে যার হৃৎপিণ্ডটা বের করে তীরবিদ্ধ অবস্থায় দেখানো হয়েছে।

বিশেষ-বিশেষ প্রাণীর যথাযথ ছবি আঁকত মদলিনিয়ান ও অরিনেশিয়ানরা। অর্থাৎ তারা প্রাণীগুলির যথার্থ রূপ দিতে পারত। এ বলে এ কথা মনে করা উচিত নয় যে, তারা কোন বিশেষ পশু বা বিশেষ প্রাণীর কথা চিন্তা না করে সাধারণভাবে পশু বা প্রাণীর কথা চিন্তা করতে পারত না। তুষার-যুগে মানুষ সাধারণভাবে বেশি চিন্তা করতে শিখেছিল। কোন বিশেষ একটা হরিণ বা কোন বিশেষ একটা বাইসনকে তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশদ বিবরণ দিয়ে না এঁকে সে কয়েকটা আঁচড়ে মোটামুটি একটা হরিণের চেহারা এঁকেই ক্ষান্ত হত। সমস্ত হরিণের বিশেষত্ব নিয়েই সে-ছবি আঁকা, অর্থাৎ সে ছবির পরিচয় হিসেবে শুধু 'হরিণ' কথাটি লিখলেই যথেষ্ট হত। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবির চিন্তা মানুষের মধ্যে তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

৮

খাদ্য উৎপাদনের যুগ

চতুর্থ বারের তুষার যুগ যখন শেষ হল, তুষারের চাপ যখন ধীরে ধীরে উত্তরে সরে গেল তখন তার সঙ্গে আস্তে আস্তে সরে গেল অতিকায় স্তন্যপায়ী জীবের দল। ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়ার চেহারায় এল নতুন পরিবর্তন।

বরফ সরে যেতে ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরভাগে অনেকটা জায়গা বনজঙ্গলে ভরে উঠল। দেখা দিল অনেক হ্রদ, যার চারদিকে লোক-বসতি গড়ে উঠল। পশু শিকার আর মাছ ধরাই ছিল এ-সব লোকের প্রধান জীবিকা। এ-সব জায়গা থেকে যে-সব নিদর্শন পাওয়া যায় তা প্রায় হাজার দুই বছর ধরে জমা হয়ে ছিল। অবশ্য লোকসংখ্যা খুব বেশি ছিল না বলেই মনে হয়।

তারপর মাত্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ডেনমার্ক, দক্ষিণ সুইডেন, উত্তর জার্মানি ও হল্যাণ্ডে আমরা দেখতে পাই কবরের উপর বিরাট বিরাট পাথরের স্মারক-স্তম্ভ। এই ধরনের পাথরের স্তম্ভ তৈরি করতে নিশ্চয়ই অনেক লোকের প্রয়োজন হত। কোন-কোন জায়গায় দুশোর মত কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। মনেহয় এ-সব পাথরের স্তম্ভ যারা বানিয়েছিল তারা অন্য কোন জায়গা থেকে এসে থাকবে। বোধহয় স্পেন থেকে নৌকো করে সামান্য-সংখ্যক লোকই ওখানে এসেছিল। স্থানীয় শিকারীদের সঙ্গে তারা মিশে গিয়ে থাকবে। কালক্রমে তাদের সন্তান সন্ততির সংখ্যা বেড়ে নিশ্চয় অনেক গুণ হয়ে উঠেছিল। এই নতুন আগন্তুকরা সম্ভবত চাষ-বাসের খোঁজখবরও রাখত। শিকারীদের সঙ্গে মিলে তারা এই উত্তর দেশে চাষ-বাসের সুযোগ-সুবিধেগুলো কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিল। আর তা থেকেই এখানে শুরু হয়েছিল সভ্যতার আর-এক জয়যাত্রা।

প্রাচীনতম চাষ আবাদ

চাষ আবাদের শুরু কিন্তু জলহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নানা জায়গায় নানাভাবে আরম্ভ হয়েছিল। অনেকের ধারণা যে, চাষ আবাদ যারা করে তারা একই জায়গায় পুরুষানুক্রমে বাস করে থাকে, কারণ জমি তো আর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যেতে পারে না। এ ধারণা আমরা যখন করি তখন মনে মনে জমির স্বত্বের কথাও আমরা ভাবি। 'সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া'—এ কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথের দুই বিঘা জমির উপেনের মত আমাদেরও চোখে জল আসে। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন জমির স্বত্ব কোন একজন মানুষের হত না। একদল লোক এক জায়গার বন কেটে বসতি স্থাপন করল, চাষ-বাস করল। তারপর আবার সে জমির উর্বরা শক্তি যেই কমে গেল তখন তারা সরে গেল আরো দূরে, নতুন বন কেটে আবার আবাদীর সৃষ্টি করতে। এখনও ভারতে নাগাদের মধ্যে এই প্রথা দেখা যায়। আদিম চাষী-গোষ্ঠীর কোন-কোন দল এমনিভাবেই সে যুগে চাষ আবাদ করেছে। এরা স্থায়ীভাবে এক জায়গায় বসবাস করত না বলেই এদের বাড়ি-ঘরও জোড়া-তাড়া দিয়ে কোনমতে তৈরি হত।

এই প্রাচীনতম চাষ-আবাদকে বাগানের চাষ বা খুরপির চাষ (hoe culture) বলা হয়। এই চাষের প্রধান সমস্যা হল জমির উর্বরতার হ্রাস। যতদিন লোকসংখ্যা কম থাকে আর জমি থাকে অপর্যাপ্ত ততদিন এ ধরনের কৃষি-কাজ চলতে পারে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে আল্‌স্‌ পর্বতের উত্তরে এই ধরনের কৃষিকাজই চলত। এমনকি কোন-কোন জার্মান গোষ্ঠী সে যুগে প্রথম-প্রথম এ-ভাবেই চাষ-আবাদ করত। প্রাচীন পণ্ডিত স্ট্র্যাবো এ-জাতীয় মানুষের চলমান সমাজের কথা উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু ভাল জমি যত কমে আসতে লাগল, এ-ধরনের চাষ আবাদ ততই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল।

যে-সব জায়গায় ঘন অরণ্যের সমাবেশ ছিল সেখানে পড়ত অঝোরে বৃষ্টি। আর বিরাট নদীর ধারে কাদা-ভরা বন্যার জলে ধোওয়া মাঠগুলিতে বীজ ফেলে দিলেই চারা গজিয়ে উঠতে দেরি হত না। ভিজে মাটি আর বন্যার জলের সাহায্য পেয়ে এ চারাগুলি বড় হয়ে উঠত, ফসল ধরত। তারপর একসময় পেকে উঠত সে ফসল। তাই সুদানে নীল নদের বন্যার জল সরে গিয়ে যখন দু-ধারের মাঠে নরম ভিজে পলিমাটির আস্তরণ পড়ত তখন সেখানকার অধিবাসীরা শস্যের বীজ ছড়িয়ে দিত সে মাটিতে। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই ফসল তুলত ঘরে।

বন্যার জলের পলিমাটিতে থাকত জমির নষ্ট উর্বরতাকে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে বন্যাধারা নদীতে বয়ে আসবার সময় সেখান থেকে বয়ে নিয়ে আসত অনেক রাসায়নিক পদার্থ যা জমির পক্ষে মূল্যবান। বিগত বছরে শস্য ফলানোর জন্যে জমিতে উদ্ভিদ-খাদ্যের যতটা ঘাটতি পড়ত বন্যা এসে তার পলিমাটি দিয়ে সে ঘাটতি পূরণ করে দিত। আর তাই বছরের পর বছর একই জমিতে শস্য উৎপাদন করলেও কোন ক্ষতি হত না।

শস্য উৎপাদন

যব আর গমই পৃথিবীর প্রথম শস্য মনে হয়। তবে মানুষ চাষ করে যব বা গম উৎপাদন করার আগেই এ-সব শস্য স্বাভাবিকভাবেই উৎপন্ন হয়েছিল। মানুষ সে-সবই খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। নীল নদের প্লাবনের পরে নরম ভিজে পলিমাটির উপরে এর বীজ ছড়িয়ে দিত আদিম মানুষ। ফলে বিনা পরিশ্রমে উৎপন্ন হত এই বন্য ঘাসের বীজ, যার উন্নত সংস্করণই এখন গম বা যব বলে পরিচিত।

পূরা-প্রস্তর যুগের মদলিনীয়ানরা যখন পুরোপুরিভাবে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে জয় করে তাদের প্রিয় শিকার-মাংস

জোগাড় করতে দক্ষ হয়ে উঠেছে তখন তাদের সংস্কৃতির মধ্যে এই শিকার-প্রাণীর মহান চিত্র আঁকা হচ্ছে। দক্ষিণবাসী মানুষের কাছে শিকার হয়ত তত সুলভ ছিল না। তাদের পুরুষরা যখন শিকার নিয়ে ব্যস্ত থাকত মেয়েরা তখন এই বন্য ঘাসের বীজ সংগ্রহ করত খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে।

মাউণ্ট ক্যারামেল এবং প্যালেস্টাইনের অন্যান্য জায়গায় প্রত্নতত্ত্ব-বিদেরা আবিষ্কার করেছেন যে, এ-সব স্থানের গুহার মধ্যে যে-সব মানুষ বাস করত তারা শিকার করত পাথরের অস্ত্র দিয়ে। নব্য-প্রস্তর যুগে যে ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হত এ-সব অস্ত্র ছিল অনেকটা সেই ধরনেরই। তারা পাথর দিয়ে কাস্তের মত অস্ত্র বানাতে পারত। এ-সব দিয়ে তারা ঘাস অথবা খড় কাটতে পারত। এ-সব পাথুরে অস্ত্র হাড়ের উপর লাগানো থাকত। ঘাস কেটে কেটে এ-সব অস্ত্রের ধার বেশ চকচকে হত। সেই চকচকে ভাব আজও নষ্ট হয়ে যায় নি। তবে, কী ধরনের ঘাস এ দিয়ে কাটা হত তা সঠিক বলা যায় না।

সময়ের দিক দিয়ে ধরতে গেলে এখন থেকে আট হাজার বছর আগে মানুষ প্রথম শস্য চাষ করেছিল বলে মনে হয়। উত্তর আফ্রিকা সিরিয়া, ইরান,তুর্কিস্থান প্রভৃতি দেশগুলিতে সে সময়ে বেশ বৃষ্টি হত। ফলে বন্য গম আর যব ফলত বিনা আয়াসে। সম্ভবত মেয়েদের কাজ ছিল এগুলিকে সংগ্রহ করে গৃহজাত করা। ক্রমে এই একই জাতীয় ঘাস (যাকে আজকাল শস্যের চারা বলে আমরা জানি) বছরের পর বছর চেষ্টা করে উৎপন্ন করাই হল কৃষিকাজ। গম আর যবের চাষ যখন চালু হল তখন সেই ক্ষেতে আরো অন্যান্য শস্যের চারা প্রথমে আগাছার মত জন্মেছিল। ক্রমে মানুষ এই আগাছার মধ্য থেকেই যই আর রাই সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে শিখল।

পশুপালন

চাষ আবাদ সভ্যতার অগ্রগতিতে এক বিপ্লবের সূচনা করেছিল বটে, কিন্তু এ বিপ্লব একদিনে আসেনি। নিছক চাষ-বাস করে জীবন ধারণ প্রায় কোন অঞ্চলেই দেখা যায় না। চাষ আবাদের সঙ্গে পশুপালন সমানভাবেই চলত। শিকারী মানুষ সম্ভবত কুকুরকেই প্রথম বশে আনে। কুকুরের সঙ্গে মানুষের সখ্য বহু দিনের।

মাংসের জন্যে যে জন্তুদের মানুষ পালন করত তার মধ্যে গরু, শুয়োর, ভেড়া আর ছাগলের কথাই জানা যায়। যে-সব জায়গায় প্রচুর ঘাস আছে সে-সব জায়গায়ই গরু বেঁচে থাকতে পারে। শুয়োর পোষবার জন্যে চাই জলা জমি বা জঙ্গুলে জায়গা। ভেড়া ছাগল পাহাড়ি জায়গায়ই ভালভাবে থাকতে পারে। একসময় পিরিনীজ পর্বত থেকে হিমালয় পর্যন্ত বুনো ছাগলের বাসস্থান ছিল। যে দেশে ঘাসের জমির পরিমাণ বেশি এবং যে-সব অঞ্চলে ঘাসের বীজই কালক্রমে শস্য হিসেবে চাষ করা হয়েছে সে-সব দেশেই আজকালকার গৃহপালিত পশুর পূর্বপুরুষরা বন্য জন্তু হিসেবে চরে বেড়াত। তবে, মিশরে সম্ভবত চাষ-বাসের সঙ্গে সঙ্গে পশু-পালনের প্রচলন ছিল না।

খাবার জন্যে মাংস সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়েই মানুষ পশুপালনের কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল গৃহপালিত পশুদের নিকট থেকে আরও নানা উপকার পেতে শিখল মানুষ। ক্ষেতের ফসল সংগ্রহ করা হয়ে গেলে পর শস্যের গোড়াগুলি পশুদের খাওয়ানো হত। সে সময় পশুগুলি ক্ষেতেই চরে বেড়াত। তাদের পুরীষ তারা ক্ষেতেই রেখে যেত। এর ফলে দেখা যেতে লাগল যে, শস্যের উৎপাদন অনেকটা বেড়ে গেছে। এ থেকেই মানুষ চাষের জমিতে সারের ব্যবহার শিখেছিল।

কাছাকাছি থেকে পশুদের দেখে এবং তাদের হাবভাব লক্ষ্য

করতে করতে মানুষ আবিষ্কার করল, কী করে তাদের দুধ সংগ্রহ করা যায়। এই কায়দা আয়ত্ত যখন হল তখন দুধই মানুষের প্রধান খাদ্যের অন্যতম হয়ে উঠল। যে-সব পশু দুধ দেয় তাদের যত্ন হল অন্য পশুদের চেয়ে বেশি। তাদের শাবকদের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হতে লাগল।

দুধের পরে পশুর লোম, বিশেষ করে ভেড়ার লোম ব্যবহার করাও মানুষ আয়ত্ত করল। মেসোপটেমিয়াতে পাঁচ হাজার বছরেরও আগে পশমের ব্যবহার ছিল। এই উদ্দেশ্যে ও-দেশে মেষ পালন করার নিদর্শন পাওয়া যায়।

পশুপালন আর কৃষি, এ দুটি কাজ একসঙ্গে চালিয়ে মানুষ তার খাদ্যভাণ্ডার নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসেছে। তা-ছাড়া কৃষি আর পশুপালন করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে। কথাটা অবশ্য পুরোপুরি ঠিক নয়। কারণ শিকারী মানুষরাও পুরুষানুক্রমে একই গুহায় বাস করেছে,এর প্রমাণও আছে। আবার এও দেখা যায় যে, চাষ করতে করতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মানুষের দল চলে গেছে।

কৃষির সঙ্গে সঙ্গেই যে মানুষ খাদ্যসংগ্রহের প্রাচীন পন্থা ছেড়ে দিয়েছে তা অবশ্য নয়। সভ্য জগতে আজও পশুশিকার একটা বিলাস। কিন্তু আজও মানুষ খাদ্যের জন্যে মাছ ধরে, ডিম সংগ্রহ করে, মধুর চাক ভাঙে। এক সময় মাছ ধরা, পশু শিকার বা ফল সংগ্রহের পরে চাষ-বাস ছিল খাদ্যসংগ্রহের একটা অতিরিক্ত ব্যবস্থা। অতি ধীরে ধীরে সেই চাষ-বাসই সমাজে প্রাধান্য লাভ করল। এর ফলে মানুষের জীবনযাত্রার চেহারা গেল পাল্টে। কৃষি-প্রধান সমাজে কৃষির সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু পরিবর্তন এল, আবিষ্কৃত হল আরও বহু পদ্ধতির।

চাষ করতে হলেই খাবার জন্যে যতটা শস্য দরকার তার চেয়ে বেশি খানিকটা শস্য পাওয়া দরকার। সবটা খেয়ে ফেললেই তো

চলে না ! বীজের জন্যে খানিকটা রেখে দিতে হয়। শস্য জমা করে খাবার সমস্যা সমাধান করার জন্যে শস্যভাণ্ডার তৈরি হয়েছে অনেক প্রাচীন কালে। মিশরের নব্য-প্রস্তর যুগের বসতিগুলিতে দেখা যায়, শস্য রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে মাটি খুঁড়ে চৌবাচ্চা তৈরি করে। তাতে খড় বা ঘাসের চাপড়ি দিয়ে ধারগুলো পোক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এ-সব নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া যায়।

শস্য-সংরক্ষণ আর পশুপালন-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে লোকসংখ্যাও বেড়ে যেতে লাগল। প্রথম-প্রথম এক একটা দল যারা শস্য উৎপাদন, পশুপালন ইত্যাদি করে জীবন ধারণ করত—তাদের প্রয়োজনীয় যা কিছু নিজেদের মধ্য থেকেই জোগাড় করে নিত। বাইরে থেকে কিছুর প্রত্যাশী হয়ে তাদের থাকতে হত না। নিজেদের খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন করত। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্রের কাঁচা মাল ধারে-কাছেই মিলত। আর এ-সব যন্ত্রপাতি গৃহস্থেরা নিজেরাই অবসর সময়ে ঘরেই তৈরি করে নিত।

অবশ্য এ-রকম মনে করলে ভুল হবে যে,অন্য কোন দলের মানুষের সঙ্গে এ-রকম এক দলের কোন সংযোগই ঘটত না। গ্রীষ্মকালে দলের যারা পশু চরাবার জন্যে নিজেদের বসতি এলাকার বাইরে চারণ-ভূমিতে যেত তাদের সঙ্গে অন্য বসতির লোকদের মেলামেশা হত। তাতে অভিজ্ঞতা এবং চিন্তার আদান-প্রদান হত। ফলে নিজেদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী যেত ভেঙে। নানা দলের শিকারীরাও মরুভূমির মধ্যের মরূদ্যানগুলিতে জল খেতে আসা পশুদের খোঁজে এসে পরস্পরের সঙ্গে আদান প্রদান করত। এইভাবে নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষের সমাজকে বিক্ষিপ্ত স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছোট-ছোট গোষ্ঠী হিসেবে না দেখে পরস্পরের মধ্যে সংযোগ-বিশিষ্ট দল বলে আমরা মনে করতে পারি।

৯

বর্বরতা থেকে সভ্যতা

নব্য-প্রস্তর যুগের আরম্ভ যীশু খ্রীস্টের জন্মের ছ-হাজার বছর আগে। মিশরের টাসা, ফায়ুম হ্রদ ও অ্যাসিরিয়ার কোন-কোন জায়গায় এ-সময় বেশ চাষ-বাস ভালরকমভাবেই চলন হয়েছে। এর কিছুকাল পরে এখানকার মত অর্থনৈতিক সংগঠন অন্য জায়গায়ও দেখা যায়। এই ধরনের সমাজগুলিতে সবকিছুই যে একই রকম ছিল তা অবশ্য নয়, তবে এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করার মত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাঠের কাজ, মাটির পাত্র তৈরি এবং কাপড় বোনা।

নব্য-প্রস্তর যুগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কৃষি-কাজ যখন বেশ ভাল-ভাবে চালু হল সে সময় উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া খণ্ডে এখনকার চেয়ে অনেক বেশি বৃষ্টিপাত হত। বর্তমানে যে-সব দেশে গাছপালা নেই সে সময় সে-সব দেশেও যথেষ্ট গাছপালা জন্মাত। এই একই সময় ইউরোপ থেকে বরফ সরে যাওয়ার ফলে সেখানকার নানা অঞ্চল বনে জঙ্গলে ভরে ওঠে। তখন মানুষের কাজ হল গাছ কেটে আবাদী তৈরি করা। এ প্রয়োজনে মানুষ গাছ কাটার অস্ত্র আবিষ্কার করল। পাথর এবং হাড় ছাড়া অন্য কোন জিনিস দিয়ে হাতিয়ার বানাবার কথা তখনও তাদের চিন্তার বাইরে ছিল। পাথরের গা ভেঙে ঘসে ঘসে ধারালো করে কুঠার তৈরি করা হত। এই অস্ত্রকে পুরাতত্ত্ববিদেরা আখ্যা দিয়েছেন পালিশ-করা পাথরের সেল্ট (celt)। পুরাতত্ত্ববিদ নব্য-প্রস্তর যুগের পরিচয় দেন এই পালিশ-করা পাথরের অস্ত্র বা কুঠার দিয়ে। এ ধরনের পাথুরে কুঠার লাগানো হত লাঠি অথবা হরিণের শিঙের মাথায়।

পুরা-প্রস্তর যুগে যে হ্যাণ্ড-অ্যাক্স ব্যবহার করা হত নব্য-প্রস্তর যুগের কুঠার কিন্তু তা থেকে আসেনি। পুরা-প্রস্তর যুগের কুঠার আসলে সাধারণ পাথর বা চকমকি পাথরের চাকলা তুলে বানানো হত। সে সময় হয়ত এতেই কাজ চলে যেত। কিন্তু পরের যুগে আরও ধারালো অস্ত্রের প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে পাথরের ধার ঘসে ঘসে তাকে মসৃণ ও ধারালো বানিয়ে মানুষ তাকে ব্যবহার করতে শিখল। এই নতুন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে মানুষ গাছ কাটতে সক্ষম হল এবং সেই গাছের কাঠ ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে লাগল। অর্থাৎ এ-সময় থেকেই ছুতোরের কাজ আরম্ভ হল। একে-একে লাঙল, চাকা, তক্তার নৌকো আর কাঠের বাড়ি—এর প্রত্যেকটাতে ছুতোরের কাজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভালভাবে ঘসা এবং ধারালো 'সেল্ট' না হলে এ শিল্পগুলি সম্ভব হত না।

মাটির পাত্র : কুমোরের কাজ

কৃষি-কাজের ফলে যে শস্যের উৎপাদন হত তা সঞ্চয় করে রাখার সমস্যার কথা আগেই বলেছি। তা ছাড়া এই শস্য রান্না করে খেতেও পাত্র লাগে। এ-সব পাত্র যাতে আগুনের তাপ সহ্য করতে পারে বা জলে গুলে না যায় তার ব্যবস্থাও করা দরকার। নব্য-প্রস্তর যুগে তখন কৃষি-কাজ বেশ প্রাধান্য লাভ করেছে। সে সময়ে মাটি দিয়ে হাঁড়ি-কুঁড়ি বানানোর চল লক্ষ্য করা যায়। পোড়া মাটির পাত্র বানানোর পদ্ধতি হয়ত নব্য-প্রস্তর যুগের আগেই আবিষ্কৃত হয়ে থাকবে, তবে, নব্য- প্রস্তর যুগেই এই ধরনের পাত্রের চল বহুল পরিমাণে দেখা যায়। নব্য-প্রস্তর যুগের কোন জায়গা খুঁড়লে ভাঙা মাটির পাত্রের চিহ্ন পাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

কাদার তাল জল দিয়ে নরম করে তাকে রোদে শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে পাত্র তৈরি করার যে কায়দা তা আয়ত্ত করতে করতে মানুষ এ সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য আবিষ্কার করল। পাত্রের

রঙ ও জৌলুস কী করে বাড়ে, আগুন কিভাবে ব্যবহার করলে জিনিসটার সৌন্দর্য আরও খোলে, এগুলি সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছিল এ যুগে। এর ফলে পাত্রগুলি যেমন আগের চেয়ে আরো বেশি সুদৃশ্য হতে লাগল, মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে রসায়ন শাস্ত্রের নানা তত্ত্বও তেমনি বেড়ে যেতে লাগল। পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে পাত্র চিত্রিত করা হতে লাগল। পাত্রগুলির আকারও নানারকম হতে থাকল। কাদার তাল ছেনে নরম করে ছোট ছোট পাত্র তৈরি করা হত, অথবা লাউয়ের খোল অথবা ঝুড়ির উপর কাদার চাপড়া লাগিয়ে পরে তা আলগা করে আনা হত। তারপর এ-সব আগুনে পুড়িয়ে প্রয়োজন-মত কাজে লাগানো হত।

কুঁজো বা বোতল-জাতীয় জিনিস তৈরি করা কিন্তু এত সহজ নয়। নব্য-প্রস্তর যুগে ইউরোপ এবং এশিয়াতে এগুলি তৈরি হত মাটির তৈরি চাকার মত জিনিস একটির পর একটি বসিয়ে। এ ধরনের কাজে বেশ কিছুদিন সময় দরকার হত।

মাটির পাত্র তৈরি করবার সময় মানুষ রসায়ন শাস্ত্রের কতকগুলি মৌলিক সূত্র আবিষ্কার করে ফেলে। এ থেকেই আবার জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও নতুন তথ্যের আবিষ্কার সম্ভব হল। কাদার তাল ছেনে পাত্র গড়িয়েই তা আগুনে দেওয়া যায় না, দিলে তা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। আবার কাদার জন্যে ঠিকমত মাটি বেছে নিতে হবে, সব মাটিতেই তো আর পাত্র গড়া যায় না! আদি যুগের কুম্ভকার তাই পাত্র গড়বার উপযোগী মাটি খুঁজতে বিশেষ ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল। তার এ দক্ষতা বংশানুক্রমে চলেছিল। তারপর কাদা ঠিকমত পরিষ্কার করে ঠিক আন্দাজ-মত জল দিয়ে মেখে নেওয়া, সেও কি কম দক্ষতার কাজ! এ মাটিতে যদি কাঁকর পাথর না থাকে, এবং এমন কিছু যদি থাকে যাতে মাটি বেশ আঁট হয়ে থাকে তবে এ মাটিকে ছাঁচে ফেলে প্রয়োজন-মত কোন আকারে গড়ে নিতে কোন অসুবিধে হয় না। তারপর কোন্ রকম মাটি কিভাবে আগুন দিলে কী

রঙ নেবে, ব্যবহারকারী দেখে খুশি হবে, আর পাত্রও হবে বেশ মজবুত, এ সব ব্যাপারটাই আদিম কুম্ভকারকে বেশ করে দেখে নিতে হত।

কুম্ভকারই তাই নব্য-প্রস্তর যুগের সার্থক শিল্পী যে বিজ্ঞানকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করেছিল। বিজ্ঞানের পরিধিও সে অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

বয়ন-শিল্প

মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার নব্য-প্রস্তর যুগের গ্রামগুলিতে কাপড় বোনা হত। তার নিদর্শন আবিষ্কার করা হয়েছে। মানুষ যখন পাথরের হাতিয়ার তৈরি করতে শিখল, তখন পশু শিকারই তার খাদ্য সংগ্রহের উপায় ছিল। পাথুরে অস্ত্র দিয়ে তারা পশু শিকার করত, পাথুরে ছুরি দিয়ে মৃত পশুর দেহ টুকরো টুকরো করত, আর ঐ ছুরি দিয়েই পশুর চামড়া ছাড়িয়ে তা পরিধান বা আচ্ছাদনের উপযোগী করে নিত। তারপর চাষ-বাসের সঙ্গে সঙ্গে শনের সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয় এবং ধীরে ধীরে তা থেকে সুতো বের করে তা দিয়ে কাপড় তৈরি করার পদ্ধতিও মানুষ আয়ত্ত করে। গৃহ-পালিত ভেড়ার গায়ের লোম থেকে বস্ত্র তৈরি করাও নব্য-প্রস্তর যুগেই আরম্ভ হয়। তবে, শন থেকে উৎপন্ন কাপড়ের প্রচলন পশম-বস্ত্রেরও আগে হয়েছে বলে মনে হয়। ক্রমে সুতোর কাপড় চামড়ার আচ্ছাদনকে হটিয়ে দিয়ে মানুষকে সভ্যতার দিকে আরও এক ধাপ ঠেলে দিয়েছিল।

অবশ্য ব্যাপারটা যত সোজা মনে হয় ততটা কিন্তু নয়। এর পেছনে আছে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার, দক্ষ কারিগরের সূক্ষ্ম দৃষ্টি আর বিজ্ঞানের নিপুণ প্রয়োগ।

প্রথম সুতোর কথাই ধরা যাক। ফায়ুমের আদিম চাষীরা শনের সুতোর কাপড় ব্যবহার করত। এশিয়া ও ইউরোপে ভিন্ন-ভিন্ন

ধরনের শনের কাপড় উৎপাদন ও ব্যবহার হত। সিন্ধু উপত্যকায় তুলোর চাষ হত যীশুখ্রীস্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে। মেসোপটেমিয়াতে ঐ একই সময়ে পশমের চলন লক্ষ্য করা যায়। পশম, শন বা তুলো—এ-সব থেকেই সুতো কাটতে হবে। কী করে তা সম্ভব হত?

পাথর বা পোড়ামাটির তৈরি ছোট-ছোট গোল-গোল ভারি জিনিস পাওয়া গিয়েছে। ইংরাজিতে এগুলিকে বলা হয় whorl। মনে হয় এগুলি সুতো কাটার জন্যে ব্যবহৃত তকলির ভারি অংশ। অবশ্য কাপড় বোনার জন্যে কাঠের তৈরি তাঁত ইত্যাদির প্রচলন থাকলেও তার নিদর্শন এতদিন পর্যন্ত টিকে থাকা বিশেষ সম্ভব নয়।

তবে সম্ভবত প্রথম দিকে তাঁতের বদলে কাঠের ফ্রেমের সাহায্যে পাটি বোনার ধরনে কাপড় বোনা হয়ে থাকবে। গত শতাব্দীতেও ক্যানাডাতে একদল আদিম অধিবাসীর মধ্যে এই ধরনের কাপড় বোনার চলন ছিল। তবে তাঁতের আবিষ্কারও চাষ-বাসের আদি যুগে অর্থাৎ নব্য-প্রস্তর যুগেই সম্ভব হয়েছিল।

তাঁত কে আবিষ্কার করেছিল আজ তা আর কেউ জানে না। কিন্তু যে-ই আবিষ্কার করে থাকুক সে যে সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। নব্য-প্রস্তর যুগের এই শিল্পগুলিতে এক গোষ্ঠীর অনেকের অনেক দিনের অভিজ্ঞতার ফল,—অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যগুলি ক্রমাগত জড় করা হয়েছে। এক পরিবারের কাজ দেখে অন্য পরিবারের লোকেরা নিজেদের শিল্পের উন্নতি করবার চেষ্টা করত। কখনও বা সারা গ্রামের মেয়েরা একসঙ্গেই হাঁড়ি গড়ত, কাপড় বুনত, পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করত এবং পরস্পরকে সাহায্য করত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের হাঁড়ি-কুঁড়ির নমুনা থেকে দেখা যায় যে, এক গ্রামে একই ধরনের হাঁড়ি বা পাত্র তৈরি হয়েছে। কাজগুলি সারা গ্রামেরই; কোন ব্যক্তিবিশেষের কাজ বলে তা মনে হয় না।

কাজের ভাগাভাগি

এই যুগেও কাজের কোন ভাগাভাগি হয় নি। অর্থাৎ যে কুমোর সে কুমোরেরই কাজ করবে, যে ক্ষেতে চাষ করে সে চাষই করবে, এ-রকম ভেদ তখনও সমাজে হয় নি। তবে, সাধারণত কাজের ক্ষেত্রে একটা ভেদ মোটামুটি থাকত, তা হল পুরুষ আর মেয়েদের কাজের ভেদ। এখনও যে সমাজে কোদাল দিয়ে চাষ হয় সে সমাজে সাধারণত মেয়েরাই চাষ করে, সুতো কাটে, কাপড় বোনে, হাঁড়ি গড়ে, শুকোয়, শুকোলে তাতে আগুন দেয় ; আর পুরুষেরা পশুপালন করে, জঙ্গল কেটে চাষের জমি তৈরি করে, মাছ ধরে, ছুতোরের কাজ করে আর তাদের যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে। এটা হল মোটামুটি একটা কাজের হিসেব ; দুনিয়ার সব জায়গাতেই যে একই রকম নিয়ম চালু ছিল তা অবশ্য নয়। কোন-কোন জায়গায় পুরুষেরাও কাপড় বুনত।

পরস্পরের সহযোগিতা

যে যুগে মানুষ পাথরের কোদাল দিয়ে চাষ-বাস আরম্ভ করল সে যুগের একটা বিশেষত্ব এই যে, সমাজে পরস্পরের সহযোগিতার মাত্রা অনেকটা বৃদ্ধি পাওয়া। একটা ম্যামথ বা বাইসন মারতে অনেক লোকের একসঙ্গে এগিয়ে আসা এবং পরস্পরের সহযোগিতা দরকার হয় ; জঙ্গল কেটে চাষ করা, ক্ষেত থেকে অতিরিক্ত জল বার করে দেওয়া, ক্ষেতে জলের বন্দোবস্ত করা, বন্য জন্তুর হাত থেকে নিজেদের এবং স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের রক্ষা করা, এ সবই অনেকের সমবেত চেষ্টা ছাড়া সম্ভব হয় না। তাই সেই আদিম যুগেও মিশরে যখন চাষ আবাদ শুরু হয়ে গ্রামের পত্তন হয়েছে তখনই দেখা যায়, অধিবাসীরা সুসম্বদ্ধভাবে বাসগৃহ নির্মাণ করে বাস করছে। এলোপাথাড়ি এখানে-সেখানে যেমন খুশি ঘর-বাড়ি তৈরির নিদর্শন দেখা যায় না। এ-সব দেখে মনে হয় সমাজ-

ব্যবস্থার পত্তন তখনই বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে, তখনকার সমাজ-ব্যবস্থা সত্যিকারের কী ধরনের ছিল এখন পর্যন্ত তা বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

নব্য-প্রস্তর যুগে অর্থাৎ চাষ-আবাদের প্রথম দিকে সমাজের আকার ছিল খুবই ছোট। এমনকি চাষ আবাদ যখন বেশ খানিকটা এগিয়েই গেছে এমন যুগেও গ্রীসের থেসালি প্রদেশে একটা সাধারণ গ্রাম প্রায় ১০০ গজ লম্বা আর ৪৫ গজ চওড়া অর্থাৎ ঠিক এক একরের সমান আয়তনের হত।

এই সময়কার ইউরোপের এক-একটা গ্রামে যে কবর আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে বেশি হলে জন-কুড়ির সমাধি আছে। আধুনিক যুগে জঙ্গল কেটে যেখানে বসতি স্থাপন করা হয় সেখানেও দেখা যায় যে, জোয়ান ছেলে গ্রাম থেকে দূরে গিয়ে জঙ্গল কেটে নতুন বসতির পত্তন করেছে। নব্য-প্রস্তর যুগে জমির কোন অভাব ছিল না। ফলে এমনিভাবেই হয়ত গড়ে উঠেছে কত গ্রাম নতুন নতুন বাসিন্দার হাতে পড়ে।

সভ্যতার দরজায়

এখন থেকে আট হাজার থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে যে সময়টা, সে সময় মানুষের অগ্রগতিতে আরও বিশিষ্ট পদক্ষেপ দেখা গেল। এই সময়ের মধ্যে মানুষ প্রকৃতি আর ইতর প্রাণীকে আরও বেশি করে নিজের কাজে লাগাতে শিখেছে। এই সময়ের মধ্যে ষাঁড় দিয়ে বাহনের কাজ করানো আরম্ভ হয়েছে, শক্তি হিসেবে বাতাসকেও আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়েছে। লাঙল, চাকার গাড়ি, পাল-তোলা নৌকো এই জ্ঞান প্রয়োগের ফল ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর একটা জিনিস মানুষ এ সময়ে আবিষ্কার করেছে যাতে করে তার অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি বানানোর ব্যাপারে এক বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়েছে। পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করার সময় আগুনের

ব্যবহার করতে গিয়ে কোন এক সময় সে তামা আবিষ্কার করে ফেলেছে। এ ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা মানুষ সঞ্চয় করেছে তাতে রসায়ন বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি এবং অন্য ধাতু নিষ্কাশনের পথ সুগম হয়েছে।

কৃষি-কাজ যত এগিয়েছে, চাষী ও বিজ্ঞানী তত সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, বৃষ্টি, নদীর বন্যা ইত্যাদি লক্ষ্য করতে অভ্যস্ত হয়েছে। এই ক্রমাগত লক্ষ্য করতে করতে দিনক্ষণ গোনা, বছরের হিসেব এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য হিসেব এবং অন্যান্য মাপ-জোকের আরম্ভ হয়েছে। সভ্যতা, যার বাহন হল লেখা—তার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে এইসময়কার জ্ঞান বিজ্ঞান।

STATE INSTITUTE OF EDUCATION

বিজ্ঞানের আগে—ম্যাজিক—ধর্ম

অনেক রকম প্রাচীন মানুষের কথা বলা হল। আমরা যে-শ্রেণীর মানুষ, বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন 'হোমো স্যাপিয়েন্‌স্', অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। ক্রমবিবর্তনের আলোচনা করে দেখা গিয়েছে, যে এই বিচার-বুদ্ধি একদিনে হয়নি। মস্তিষ্কের গঠন দিনের পর দিন যখন পরিবর্তিত হতে হতে এযুগেরমানুষের মস্তিষ্কের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তখন দেখা যাচ্ছে মানুষ পাথর ভেঙে অস্ত্র তৈরি করে শিকার করছে আর শিকার করার জন্যে নানারকমের তুক-তাকের সাহায্য নিচ্ছে। শিকার করতে গিয়ে মানুষ ফাঁদ পেতে পশুপাখি ধরার কায়দা আয়ত্ত করেছিল। পশু-প্রাখিদের স্বভাবও তারা জেনেছিল এবং তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যগুলি তাদের সন্তানদের জানিয়ে গিয়েছিল। প্রাণী-বিদ্যার সূত্রপাত এমনিভাবেই হয়েছিল।

কিন্তু পশু-প্রাণীদের উপর নিজেদের ক্ষমতা বিস্তারের জন্যে তারা যে শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্য নিত তা নয়। তাদের গুহার ছবিগুলি দেখে মনে হয়, ওগুলি ম্যাজিক বা জাদুবিদ্যারই একটা রূপ। বাণবিদ্ধ বাইসন আঁকা রয়েছে গুহার দেয়ালে। যে শিল্পী এসব এঁকেছে সে হয়ত গোটা গোষ্ঠীর জন্যেই এঁকেছে। আর এ আঁকা নিছক আনন্দের জন্যেই নয়। এটা বোঝা যায় যখন দেখা যায় যে, কত কষ্ট করে, কত দুর্গম স্থানে গিয়ে এ-সব চিত্র আঁকা হয়েছে। তা ছাড়া পশুদের কোন অস্ত্র দিয়ে আহত করা হয়েছে এ-রকম অবস্থাতেই এ-সব চিত্র আঁকা।

মানুষ যতই বিভিন্ন প্রকৃতির শক্তি আয়ত্তে আনতে লাগল ততই তার জ্ঞান বিজ্ঞানের কতকগুলি ট্র্যাডিশন বা ধারা বংশানুক্রমে চলে

আসতে লাগল। কতকগুলি ক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্পর্ক মানুষ লক্ষ্য করেছে ঠিকই, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন শিল্প-কাজ করবার পদ্ধতি একটা নির্দেশ হিসেবেই চলে এসেছে। তা-ছাড়া এসেছে নানা ধরনের প্রবাদ-বচন, সূত্র ইত্যাদি। এ-সবের সাহায্যেই সরল মানুষ দৈনন্দিন কাজ চালিয়েছে বহুদিন ধরে।

বিজ্ঞানই বল ধর্মই বল, মূলে কিন্তু সবই প্রকৃতির উপর ক্ষমতা বিস্তার করে তার শক্তিকে মানুষের কাজে লাগানোর চেষ্টা। পুরা-প্রস্তর যুগে মানুষ যে মৃতদেহ যত্ন করে মাটির নিচে পুঁতে রেখে দিত তা থেকে বোঝা যায় যে মৃত্যুর পরেও মানুষের একটা কিছু অস্তিত্ব সম্বন্ধে সেকালের মানুষের ধারণা ছিল। মানুষের জীবনযাত্রা-পদ্ধতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, মৃতদেহের জন্যে নানাধরনের সমাধি রচনা করা হয়েছে। সমাধিগুলি হয় বাসগৃহের সঙ্গে, অথবা গ্রামের কাছে অবস্থিত। মৃতদেহের সঙ্গে সাধারণত বাসনপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য পানীয়-সমেত পাত্র এবং প্রসাধনের জিনিস দিয়ে দেওয়া হত। খাদ্য ও পানীয়ের পাত্রে অনেক সময় নানারকমের চিত্র আঁকা থাকত। মিশরে পাওয়া এইসব পাত্রের গায়ে জন্তুদের ছবি আঁকা থাকত। গুহার মধ্যে যে কারণে পশুদের চিহ্ন আঁকা থাকত তার সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ থাকা বিচিত্র নয়।

মৃত্যুর পর পিতৃপুরুষদের মাটির নিচে রাখা হত। এ মাটিই আবার কৃষিজীবী মানুষের খাদ্য জোগায়। তাই পূর্বপুরুষদের আত্মা সন্তুষ্ট থাকলে খাদ্যোৎপাদন ভাল হবে, এই ধারণা বদ্ধমূল হতে লাগল সেকালের মানুষের মনে।

নব্য-প্রস্তর যুগে সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর শিল্প-কৌশল বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে ম্যাজিক এবং নানা ধরনের সাঙ্কেতিক ক্রিয়া-কলাপের বেশ প্রাচুর্যই দেখা যায়। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে কবচ জাতীয় বস্তুর চিহ্ন পাওয়া গেছে। কোন এক জায়গায় খুব ছোট পাথরের কুড়োল ছিদ্র করে গলায় ঝোলানো হত। বোধহয়

এই হাতিয়ারটির শক্তি নিজের মধ্যে আনবার জন্যেই এ উপায়টির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকবে।

কৃষি ও জাদু

কৃষি-নির্ভর সমাজে জমির উর্বরতা এক মস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। জাদুমন্ত্র দিয়ে এই জমির উর্বরতা বাড়ানোর প্রথা নব্য-প্রস্তর যুগে ছিল। নব্য-প্রস্তর যুগের কবরগুলিতে ছোট-ছোট মাটির নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলো দেখতে অনেকটা পুরা-প্রস্তর যুগের পাথরের মূর্তির মত। এ মূর্তিকে মা ধরিত্রীর মূর্তি বলে ধারণা করা হয়েছে, কারণ বসুন্ধরাকে বলা হয়েছে জননী, যার গর্ভ থেকে বের হয় শস্যগাছের চারা।

প্রাচীন কালে পূর্বদেশের এক প্রথার কথা এখানে বলা যেতে পারে। 'এক রাজা ও রানীর বিয়ে' নামে একটি উৎসবের প্রচলন ছিল সেকালে। সমাজ থেকে একটি পুরুষ ও নারী বেছে নেওয়া হত। এরা আসলে দেবদেবীর স্থান নিত। তারপর নানা উৎসব হত। উৎসব শেষে পুরুষটিকে মেরে ফেলা হত। এই সাঙ্কেতিক উৎসবের অর্থ, পৃথিবী এতে উর্বরা হয়ে ফলপ্রসূ হবে। মাটিতে বীজ পুতলে তবে গাছ হয়। মৃত মানুষকে আবার মাটিতে পোতা হয়। এই উপমা থেকেই পুরুষটিকে মেরে ফেলা হত, তার দেহ পোতা হত মাটিতে। কারণ পুরুষটিকে ধরা হত বীজের প্রতীক। তার নাম দেওয়া হত 'শস্য রাজ'। হয়ত এইরকম কোন ধারণা থেকেই বীজ বপনের সঙ্গে রক্তদান বা মানুষ-বলির সম্পর্ক নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষের মনে স্থান পেয়েছিল। প্রাণ দিতে হত কোন যুবক বা যুবতীর। অবশ্য সমাজের চোখে এদের দেবতার মত গণ্য করা হত।

ক্রমে এই প্রথা আরও সাঙ্কেতিক হয়ে উঠেছিল। নিজের প্রাণ বিসর্জনের পরিবর্তে কোন বন্দীকে হত্যা করে বা শুধু মন্ত্রপাঠ করে

সমাজের সন্তুষ্টি বিধান করা হত। এর ফলে শস্যরাজ প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে।

কৃষি আর পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে ধাতুর ব্যবহার বেড়ে চলল। প্রাকৃতিক শক্তির উপরে মানুষের প্রভুত্ব আর শিল্পকলার উৎকর্ষ যত বেড়ে চলল ততই যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি হতে লাগল। মানুষের ভাবের আদান প্রদান আর পণ্যের আদান প্রদানও বেড়ে যেতে লাগল। মানুষের বসতিগুলি আর ছাড়া-ছাড়া, নিঃসম্পর্ক রইল না। বাণিজ্যের এবং অন্যান্যভাবে যোগাযোগের প্রসার হল। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে কোন কোন অঞ্চলে আমদানি হত নানারকমের পাথর। এ-সব পাথরের জাদুশক্তি সম্বন্ধে মানুষের বিশ্বাস জন্মেছিল। মিশরের লোকেরা চোখের পাতার উপরে ম্যালাকাইট রঙের প্রলেপ লাগাতো। ম্যালকাইট হল একরকম খনিজ পাথর যা থেকে তামা পাওয়া যায়। এ প্রলেপ তৈরি করার সময় এক বিরাট অনুষ্ঠান হত। এগুলি যে থলিতে নেওয়া হত তার আকার হত কোন পশুর মত, আর তার উপরে থাকত কবচের অলঙ্করণ। আসলে এই প্রলেপ মিশরীয়দের চোখ সূর্যের প্রখর আলো থেকে বাঁচাতো, মাছি থেকে উদ্ভূত রোগের হাত থেকে চোখকে রক্ষা করত। কিন্তু ও-দেশের অধিবাসীরা মনে করত, এটা জাদুরই কোন ব্যাপার। এ-জন্যেই দেখা যেত এত তাবিজ কবচের বাহুল্য, জীবজন্তুর আকারের থলিতে এ উপকরণগুলি বয়ে নেওয়ার পদ্ধতি। বিদেশ থেকে আরও অনেক জিনিস আমদানি হত যার এইরকম জাদু-ক্ষমতা থাকত।

আজকের সুসভ্য মানুষও কিন্তু সে-যুগের জাদুগুণ-সম্পন্ন কোন-কোন জিনিস ব্যবহার করে আনুষ্ঠানিকভাবে। অবশ্য এ যুগের মানুষ এ-সব জিনিসের মূল কারণটা নিয়ে বড় মাথা ঘামায় না। কড়ি একটা জিনিস যা আমাদের লক্ষ্মীর ঝাঁপির একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ। এই কড়িকে সে যুগে জমির উর্বরা-শক্তি বাড়াবার উৎস

হিসেবেই মনে করা হত। কৃষিজাত জিনিসই ছিল সে-যুগের ধন। তাই আজও ব্যাপারী তার পয়সার থলির মধ্যে একটা কড়ি রেখে দেয়। তারা বলে, কড়িই লক্ষ্মী, এ থেকেই আমদানি বাড়ে।

নানারকম রত্ন ও মণি-মুক্তার মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে, এ বিশ্বাস আজও চলে আসছে। আদিম মানুষের কাছে এগুলো ছিল অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, বিলাসের উপকরণ নয় মোটেই।

পুরা-প্রস্তর যুগে আমরা দেখেছি, কোন প্রাণীর অনুকরণে যদি তার চিত্র আঁকা বা গঠন করা যায় তবে নাকি সে-পশুর উপরে ক্ষমতা বিস্তার করা যেতে পারে। আবার আর একরকম জাদুরও প্রচলন দেখা গিয়েছে সে-যুগে। এটি হল, আসল জিনিস বা কোন জন্তুর দেহ বা দেহ-সংলগ্ন কোন অংশ বা জিনিসের সাহায্যে সেই পশু-প্রাণীর উপর ক্ষমতা বিস্তার করা। কোন জন্তুর নখ বা চুল দিয়ে তৈরি তাবিজ কবচ ব্যবহার করে রোগ সারানোর প্রথা আজও নানা দেশে প্রচলিত আছে। এর মূলেও রয়েছে সেই প্রাচীন সমাজের বিশ্বাস।

কবচ তৈরির শিল্প

রত্ন বা মুক্তার ক্ষমতা সম্বন্ধে বিশ্বাসের কথা আগেই বলেছি। এগুলি কোন বিশেষ আকারে তৈরি করে ধারণ করতে না পারলে কার্যকর হয় না। কোন জন্তুর আকারে রত্ন কেটে তা ব্যবহার করাই ছিল সব-চেয়ে বেশি প্রচলিত। ক্রীট থেকে তুর্কিস্তান পর্যন্ত এই ধরনের কবচ-বানানো শিল্পের এক বিশাল কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে একদল লোক এই শিল্প নিয়েই ব্যস্ত থাকত।

ক্রমে জন্তু-জানোয়ারের আকারে রত্ন কাটার জায়গায় এল রত্নের বা কবচের উপরে কোন পশুর প্রতিকৃতি বা অন্য কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকার পদ্ধতি। শিল্পীরা নিপুণ হাতে এগুলি ক্ষুদে দিত। এর আর-একটা দিকও ছিল। পাথরের উপর ক্ষোদাই-করা কোন

একটা জাদুর সাঙ্কেতিক ছাপ কাদার মত নরম জিনিসে উঠিয়ে নেওয়া হত। পাথরের অন্তর্নিহিত জাদু-শক্তি এ উপায়ে ঐ ছাঁচেও চলে যেত বলে লোকের বিশ্বাস হল। ঐ ছাপ দিয়ে কোন জিনিস যদি শক্তিমান করা হয়, তবে যে তা ভাঙবে তার বিপদের ভয় থাকত। পাছে ভাঙলে কোন বিপদ হয় এই ভয়ে লোকে তা ভাঙত না। এই ক্ষোদাই-করা পাথরগুলিই সীলমোহর হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং এর অন্তর্নিহিত শক্তি সমাজ-মনের উপর কাজ করত খুবই। এই সীল দিয়ে কোন জিনিস সংরক্ষিত করার নাম দেওয়া হয়েছে ট্যাবু (taboo)। ফলে এ-ধরনের সীলমোহরের সাহায্যে সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং মালিকানা স্বত্বও জারি হতে থাকল।

অ্যাসিরিয়ার অতি আদিম নব্য-প্রস্তর যুগের বসতি-স্থান থেকে এই ধরনের সীল আবিষ্কার করা হয়েছে। প্রাচীন কালে ইরানে ও ইউফ্রেটিস নদীর ধারে এর প্রচলন ছিল। মিশর ও ভূমধ্য-সাগরীয় দেশগুলিতে ছিল কবচের বহুল প্রচলন। কিছুদিনের মধ্যে অবশ্য উত্তর অঞ্চলেও এ দুটি জিনিসেরই ব্যবহার চালু হয়।

রত্ন অন্বেষণ ও সমাজের বিস্তার

জাদুশক্তি-বিশিষ্ট রত্ন, সামুদ্রিক কড়ি এবং তারপরে সোনা, এ সব আদিম কাল থেকেই মানুষের অন্বেষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর ফলে এক গোষ্ঠীর লোকের সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর লোকের আদান প্রদানের সুযোগ বেড়ে যায়। এইসব জাদুশক্তিসম্পন্ন জিনিসের বিনিময় হত শস্য আর ফলের সঙ্গে। ক্ষেত্রের উর্বরতা বৃদ্ধির কামনায় আর নিজের ভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রসন্ন করার জন্যে চাষী তার ক্ষেত্রে উৎপন্ন জিনিসের সঙ্গে এইসব রত্ন-পাথরের বিনিময় করত। প্রাচীন বাণিজ্যে রত্ন আর পাথরের মালই বোধহয় ছিল সবচেয়ে বেশি।

এ কথা বলা যেতে পারে যে, এই জাদুর জিনিস খুঁজতে গিয়ে

সভ্যতার প্রসার হয়েছে। ম্যালাকাইটের কথা আগেই বলা হয়েছে। হয়ত এরই খানিকটা অংশ আগুনে পুড়ে তা থেকে তামা বেরিয়ে পড়েছিল। এরই ফলে শুরু হয় ধাতুবিদ্যার পত্তন। আফ্রিকার কাটাঙ্গা অঞ্চলে কাফ্রীদের ক্যাম্প-ফায়ারে এমনি করেই তামার মালা তৈরি করার নজির আছে। প্রাচীন মিশরীয় সমাধিতে তামার পিন, বর্শা প্রভৃতি আবিষ্কার করা হয়েছে। তামা নিষ্কাশন করে তারপর তা থেকে নানারকমের যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করার উপায় বের করার মধ্যে মানুষের চিন্তাধারার এক উন্নত অবস্থার পরিচয় আমরা পাই। তামার সঙ্গে টিনের খাদ মিশিয়ে তাকে আরও শক্ত করে মজবুত জিনিস তৈরি করার মধ্যেও রসায়ন বিদ্যার জ্ঞানের কথাই আমরা জানতে পারি। যীশুখ্রীস্টের জন্মের চার হাজার বছর আগে মধ্য-প্রাচ্যে ধাতুর বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবহার বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। ক্রমে পাথরের জায়গা নিয়েছে ধাতু। মানুষ ক্রমে বুঝতে পারল যে, পাথরের চেয়ে ধাতুর ব্যবহার অনেক সুবিধেজনক। প্রকৃত-পক্ষে ধাতুর ব্যবহার মানুষের জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিল। এর ফলে মানব-সভ্যতার ধারাই গেল বদলে। মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডার ভরে উঠতে লাগল ক্রমে ক্রমে, সম্ভব হতে লাগল নতুন নতুন শিল্পসৃষ্টি।

জাদু ও বিজ্ঞান

মানুষের মন একদিকে যেমন দেবদেবী, নানারকব সংস্কার ও লোকাচার দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল তেমনই আবার প্রকৃতির নানা ব্যাপার লক্ষ্য করে তার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করবার আকাঙ্ক্ষাও হয়ে উঠেছিল প্রবল। প্রয়োজনের তাগিদে তথ্যের পর তথ্য সংগৃহীত হয়ে গড়ে উঠল পদার্থ-বিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা,ধাতু-বিদ্যা প্রভৃতি। প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা লক্ষ্য করল যে, বছরের একটা বিশেষ সময় নীল নদীতে বন্যা শুরু হয়। এ সময়টা তারা ঠিক

করে নিল আকাশের কোন বিশেষ নক্ষত্র-মণ্ডলের অবস্থান দেখে। এমনিভাবেই তারা দিন গোনার কাজে দক্ষ হয়ে উঠল। এর থেকেই সৌর ক্যালেণ্ডারের জন্ম। এতে একদিকে যেমন প্রকৃত জ্যোতির্বিদ্যার সূচনা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই বিভিন্ন গ্রহ, তারা, নক্ষত্র প্রভৃতি ভাগ্যনিয়ন্তা বলে গণ্য হয়েছে। কোন নক্ষত্রের অবস্থান থেকে শস্যের বীজ বোনবার সময় বোঝা যায়, কোনটা আবার বন্যার জলে ঘর-বাড়ি ভাসানোর অমঙ্গল সূচনা করে। ফলে একই সময় গণিতজ্ঞ এবং গণৎকারের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আয়ত্তে আনবার জন্যে তাদের পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা হতে লাগল সমাজে। অন্যদিকে আবার প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে বোঝবার চেষ্টা চলতে লাগল।

আমরা দেখলাম যে, হোমো সেপিয়েন্স্ অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে তাদের আয়ত্তের মধ্যে আনবার জন্যে নানা উপায় উদ্ভাবন করেছে। সে উপায় হল তার অস্ত্রশস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করার নতুন নতুন কায়দা এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে উন্নত ও আরো উপযোগী উপাদানের প্রয়োগ। এ-সব উপায় অবলম্বনে মানুষকে এক স্তর থেকে আর-এক স্তরে পৌঁছতে যেমন সময় লেগেছে, তেমনি আবার এক-একটি নতুন কায়দা বা নতুন উপকরণ আবিষ্কার হলেই মানুষের জীবন-যাত্রার পদ্ধতিতে এসেছে অনেক পরিবর্তন। পায়ের জায়গায় এসেছে চাকা, নিজের শক্তি আরও জোরালো হয়েছে গরু ষাঁড়ের সাহায্য নিয়ে। তামার পাত দিয়ে শক্ত করা কাপড়ের পালের নৌকো মানুষকে অনেক গভীর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দেশান্তরে যাবার সুযোগ করে দিয়েছে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে সে মাটি থেকে ফসল তুলে অন্ন-সমস্যা ও পরে বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করেছে। এইসঙ্গে আরও একটা দিক গড়ে উঠেছে। তা হচ্ছে মানুষের মন। জাদু-মন্ত্র এবং অন্যান্য মন্ত্র-তন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে। আর এ-সব থেকেই সমাজে সৃষ্টি

হয়েছে একদল শক্তিমান পুরুষ যারা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এরাই সমাজের রাজা ও পুরোহিত।

সংক্ষেপে মানুষের আদিম অসভ্যতা থেকে বর্বরতা ও বর্বরতা থেকে সভ্যতায় আসার এ-ই হল ইতিহাস। সভ্যতার দরজায় যখন আমরা মানুষকে দেখতে পাই তখন একই ধরনের সংস্কৃতির প্রচলন দেখা যায় মিশরের নীল নদ থেকে সিন্ধু নদ বা প্রায় ভারতবর্ষের গঙ্গা নদী পর্যন্ত। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এখনও মাটি খুঁড়ে এই সংস্কৃতির প্রমাণ বের করে চলেছেন। কখনও কখনও এক-এক অঞ্চলে পাওয়া হাঁড়ি-কুঁড়ি বা সমাধিতে বিচিত্র পরিবর্তন দেখা যায়। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, মানুষের দল কখনও-কখনও এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গিয়ে বসতি গড়েছে। এর মূলে রয়েছে হয়ত বন্যা, দুর্ভিক্ষ, বা পশুর খাদ্য-শস্যে অজন্মা। এতে এক ধরনের সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষের দল আর-এক অঞ্চলে এসে পড়েছে। হয়ত ঘাসের দেশের লোক বাস করবার জন্যে এসেছে নদীর উপত্যকায়। এর থেকে হয়েছে নানা সংস্কৃতির সংমিশ্রণ। আদান-প্রদান হয়েছে অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম বিশ্বাস—সব কিছুরই। অবশ্য এ-ব্যাপারটা যে সব সময়ে শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে তা নয়। মানুষ দলে দলে চলে। এক দল আর এক দলের এলাকায় এলে সাধারণতই স্থানীয় দল সেটা পছন্দ করেনি — হয়ত বাধা দিয়েছে। ফলে দু-দলে লড়াই হয়েছে। এমনও হতে পারে যে, দল বেঁধে লড়াই করবার উদ্দেশ্যেই এক অঞ্চলের লোক আর-এক অঞ্চলের লোকের উপর চড়াও হয়েছে। যুদ্ধে জিতে সে দেশের লোককে দমন করেছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে অবশেষে মিশেও গিয়েছে।

আগন্তুকেরা স্থানীয় লোকদের উপর তাদের নিজেদের আচার ব্যবহার, সংস্কার, সংস্কৃতি—সবই চাপিয়ে দিয়ে থাকবে কিছুটা। স্থানীয় লোকেরাও তার কিছু-কিছু মানিয়ে নিয়ে থাকবে। তা-ছাড়া তাদের নিজেদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির প্রভাবও আগন্তুকদের

উপর পড়া বিচিত্র নয়। এমনি ধরনের আদান প্রদান এবং সংমিশ্রণের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে নতুন সংস্কৃতি।

এই বিজয় অভিযান, এই যুদ্ধই হল আধুনিক মানুষের সমাজের গোড়াপত্তন। চাষ-আবাদের গ্রাম থেকে ব্যবসা বাণিজ্যের শহরে পৌঁছবার জন্যে মানুষের যে বাড়তি মূলধনের দরকার ছিল এই লড়াই জিতে মানুষ সেটা সংগ্রহ করে। শহর গড়তে 'হলে চাই একদল লোক যারা চাষ-বাস অর্থাৎ খাদ্য উৎপাদনের দৈনন্দিন চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে। শহর রক্ষার জন্যে, বণিকদের রক্ষার জন্যে একদল রক্ষী চাই। শিল্পে নিযুক্ত রইল একদল লোক, অন্যদল রইল যান-বাহন চালানোর কাজে। ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোর জন্যেও দরকার হল একদল লোকের। তা-ছাড়া আইন শৃঙ্খলা বজায় রেখে শাসন করবার জন্যেও একদল লোকের সৃষ্টি হল। এ-সব লোকের খাওয়ার জিনিস উৎপাদন করবে একদল যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস উৎপাদন করবে ; কারণ বিদেশী জিনিস বিনিময় করার জন্যে তার দরকার। অজন্মার সময়ের জন্যে আগে থেকে খাদ্য সংরক্ষণ করে রাখারও দরকার।

ঘাসের জমির যাযাবররা যখন চাষীদের আবাদী জমি জয় করল তখন তারা সেই চাষীদেরই ক্ষেতে কাজ করতে দিল, অন্যান্য কাজের জন্যে নিয়োগ করল নিজেদের। চাষীদের বাধ্য করা হল নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করে নতুন প্রভুদের জন্যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতে। এমনিভাবে সমাজে একদল প্রভুর সৃষ্টি হল, এরা সংখ্যায় যদিও চাষীদের চেয়ে কম তবু বাহুবলে তাদের উপর প্রভুত্ব করতে লাগল। বাহুবলের সঙ্গে তাদের উন্নত অস্ত্র আর শাসন-ক্ষমতা তাদের শক্তি দিল।

দাসত্ব-প্রথা

এই সমাজ-ব্যবস্থায় যুদ্ধ আর-একটা জিনিস এনে দিল যা সমাজে বহুদিন চলে এসেছে, এমনকি সভ্য সমাজেও। এ হল দাসত্ব-প্রথা।

মানুষ পশুকে যেমন বশ করতে শিখেছিল, মানুষকেও তেমনি বশ করবার বুদ্ধি বের করল। যুদ্ধে পরাজিত মানুষকে না মেরে ফেলে তাকে দিয়ে পশুর মত কাজ করানোর প্রচলন হল। পশুর মত এদের মরণ বাঁচনেরও ভার রইল প্রভুদের উপর। তবে, যুদ্ধ ছাড়া অন্য কারণেও সমাজে দাসত্বের উৎপত্তি হয়েছে। সেটা হল সমাজে বলবান যখন দুর্বলের উপর প্রভুত্ব করেছে তখন। সমাজ-ব্যবস্থায় বিদ্রোহীকে যখন এক গোষ্ঠীর লোক নির্বাসিত করেছে তখন সে অন্য এক গোষ্ঠীতে গিয়ে দাস হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করেছে। ইস্রায়েলের লোকেরা ইস্রায়েল থেকে বিতাড়িত হয়ে মিশরে গিয়ে দাসত্ব অবলম্বন করেছে, এ জনশ্রুতি পরবর্তী লেখকেরা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

রাজার আবির্ভাব

মানুষের নানা দল, গোষ্ঠী ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। শস্যরাজ-এর কথাও তোমরা পড়লে। এও দেখলে, পরবর্তী যুগে শস্যরাজ নিজে না মরে অন্যকে বলি দিয়ে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। রাজতন্ত্রের প্রথাটা কোথায়, কবে আরম্ভ হয়েছিল এখনও ঠিক জানা যায় না। তবে উত্তর ও দক্ষিণ মিশর এক হয়ে যাওয়ার পর সেখানকার রাজবংশগুলির নাম পাওয়া গিয়েছে। মিশরের প্রথম ফারাও মেনেস বোধহয় উত্তর মিশরের রাজা ছিলেন। উত্তর দক্ষিণ মিশর মিলে যাওয়ার পরই সেখানে নগর সভ্যতার পত্তন হয়। এ থেকে মনে হয় নগরের উৎপত্তির আগেই মিশরে রাজতন্ত্রের প্রচলন হয়েছিল। সুমের-এও 'বিরাট বন্যার' আগেকার রাজাদের নাম পাওয়া যায়। তাতে মনে হয় সেখানেও এই প্রথা নগর তৈরির আগেই চালু হয়েছিল।

রাজতন্ত্রের মূলে ছিল হয়ত যুদ্ধজয়ের দলপতিত্ব। কিন্তু আদি রাজাদের হাতে যে শক্তি ছিল তা বাহুবলের চেয়েও বেশি; এ হচ্ছে তাঁদের জাদু-শক্তির উপর দখল। জাদু আর ধর্ম দু-দিকেই নেতৃত্ব

করবার মত সমাজে তাঁদের প্রতিষ্ঠা। অবশ্য এ-সময়ে জাহু আর ধর্মকে আলাদা করে দেখা যায় না। এই উভয় শক্তির অধিকারী বলে এঁরা সমাজে একটি বিশেষ জায়গা দখল করে থাকতেন। লোকে এঁদের মানত, এঁদের উপঢৌকন দিত। ক্রমে এঁরা দেবতার আসনে পর্যন্ত অধিষ্ঠিত হলেন এবং মানুষ এঁদের মৃত্যুর পরেও দেবতার মত পুজো করতে লাগল।

যাক সে কথা। সমাজে বোধহয় জাহুকরই প্রথম মানুষ যাকে খাদ্য উৎপাদন থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে তার অপার্থিব শক্তিকে বাড়ানোর সুযোগ সমাজ দিয়েছিল; জাহুকরের দণ্ডই বোধহয় রাজদণ্ডের আদি। আজও যে দেশে রাজা আছে সে দেশের রাজার অভিষেক ইত্যাদি প্রথার মধ্যে লুকিয়ে আছে এই আদিম জাহুকরের তন্ত্র-মন্ত্র, ক্রিয়া-প্রক্রিয়া।

মিশরে এই জাহুকর পুরোহিতই নীলনদীর বন্যা সম্পর্কে মিশরের চাষীদের অবহিত করে দিতেন। চাষীরা মনে করত নীল নদের জল, যার উপরে মিশরের মরণ বাঁচন নির্ভর করছে, তার বাড়া-কমার সঙ্গে এই জাহুকর পুরোহিতের কোন সম্পর্ক আছে। এ-রকম কোন জাহুকরই সিরিয়াস তারার অবস্থান আর নীলের বন্যার সম্পর্ক দেখে একটা সৌর ক্যালেণ্ডারের উদ্ভব করে থাকবে। এর সাহায্যে এই জাহুকররা ঋতুগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করত। আর এই ধরনের জ্ঞানের একমাত্র চাবি-কাঠি ছিল এই জাহুকরদের কাছে। মানুষের জীবন মরণের উপর এই যে ক্ষমতা, এতেই সম্ভবত জাহুকর পুরোহিত মিশরের রাজার পদে উন্নীত হন। রাজাকে মিশরীয়েরা দেবতার মত পুজো করত।

১১

ভারতে নৃতত্ত্বের চর্চা

আমাদের এ ভারতবর্ষে নৃতত্ত্বের চর্চা বহুকাল আগে থেকেই শুরু হয়েছে। দেশের ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ ও ধর্মসূত্রগুলিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জাতি-গোষ্ঠীর বিবরণ ও পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক আইন কানুন অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা রক্ষা করেই তৈরি হত। তবে আধুনিক নৃতত্ত্বের চর্চা শুরু হয়েছে এখন থেকে শ-দেড়েক বছর আগে থেকেই।

কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি

১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এটি একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এটি উদ্বোধন করতে গিয়ে বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত স্যর উইলিয়ম জোন্স ভারতের বিভিন্ন জাতির লোকদের জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতির নিখুঁত আলোচনার কথা বলেন। পরে এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক সংস্কৃতির সুন্দর আলোচনা প্রকাশিত হয় সোসাইটির পত্রিকায়। তৎকালীন ইংরেজ শাসকদের ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানবার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকরা তাদের ধর্ম প্রচারের জন্যে এ দেশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, আচার ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করতেন।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় হ্যামিলটন বুকানন বাংলাদেশের জাতিতত্ত্ব ও সংস্কৃতির বিবরণ সংগ্রহ করেন। এরপর ডালটন ও স্যর হারবার্ট রিজলে বিভিন্ন সময়ে বাংলা, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীদের বিবরণ লেখেন তাঁদের বিখ্যাত বইগুলিতে। তা-ছাড়া

রোজ, অনন্তকৃষ্ণ আয়ার, থার্স্টন, এইকস্টেড্ট্, লাইয়াল, হাটন, মিল্স্, গর্ডন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। এ প্রসঙ্গে বাঙালী নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের কথা উল্লেখ করবার মত। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দ থেকে দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের আগে পর্যন্ত তাঁর যে সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছে নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে তা বাস্তবিকই অমূল্য।

প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব

প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব বিষয়টি নৃতত্ত্বেরই একটি অংশ। কারণ প্রাচীন যুগের জীবনযাত্রাই হল এর অনুসন্ধানের একটি বিষয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পাহাড়ের গায়ে ও নদীর ধারে সেকালের বহু পাথুরে অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে যাঁরা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে রবার্ট ব্রুস ফুট, ব্রাউন প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। নানা জায়গা থেকে পুরা-প্রস্তর যুগ এবং নব্য-প্রস্তর যুগের বহু অস্ত্র পাওয়া গেছে। এ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র থেকে পণ্ডিতেরা বলেন যে, প্লাইস্টোসিন যুগ থেকেই ভারতবর্ষে মানুষের বসবাস ছিল। 'ইয়েল ক্যাম্ব্রিজ অভিযান'-এর ফলে কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে যে সব পাথুরে নিদর্শন পাওয়া গেছে সে-সব থেকে বলা যায় যে, এই সময়ে উত্তর ভারতে মহাতুষারের অস্তিত্ব ছিল। তুষার যুগের চরম ঠাণ্ডা এবং তার পরের যুগের গরম অবস্থায় সেখানকার মানুষ সাধ্য অনুসারে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করেছে। দক্ষিণ ভারতে পালাক্রমে শুষ্কতা ও আর্দ্রতার রাজত্ব চলছিল।

সেকালকাল পাথুরে অস্ত্রের মধ্যে প্রধানত দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এর একটি হল উত্তর ভারতের সোয়ান সংস্কৃতি, অন্যটি দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ সংস্কৃতি। মসৃণ পাথরের নুড়ি থেকে হাতিয়ার বানানো হল সোয়ান সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। সিন্ধুনদের উপনদ সোয়ান থেকেই এই সংস্কৃতির নাম। পাঞ্জাব থেকে যতই দক্ষিণ দিকে

এগোনো যায় ততই নুড়ির কাজ বিরল হয়ে পড়ে। নর্মদা নদীর দক্ষিণে নুড়ির কাজ নেই বললেই চলে। এ অঞ্চলে যে পাথুরে অস্ত্র পাওয়া গেছে তা তৈরি করা হয়েছে পাথরের বড় টুকরো বা উপলখণ্ড থেকে। এ-ধরনের অস্ত্রই হল মাদ্রাজ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। সোয়ান সংস্কৃতি ও মাদ্রাজ সংস্কৃতির অদ্ভুত মিলন দেখা যায় পূর্বভারতে, বিশেষ করে ময়ূরভঞ্জ এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রস্তর যুগের মানুষের কঙ্কাল বা হাড়ের তৈরি কোন অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

নব্য-প্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য হল কৃষিকেন্দ্রীক মানুষের গ্রামীণ জীবনযাত্রা। এর-পর ধাতুর ব্যবহার এবং শহরের উৎপত্তি মানুষকে ইতিহাসের দোর-গোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। লিপির আবিষ্কারই প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োতে খ্রীঃ পূঃ আড়াই হাজার থেকে খ্রীঃ পূঃ দেড় হাজার বছর পর্যন্ত লিপি ব্যবহারের প্রচলন ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই লিপি আজ পর্যন্ত পড়া সম্ভব হয় নি।

দৈহিক নৃতত্ত্বের চর্চা

ভারতে দৈহিক নৃতত্ত্বের চর্চাও বহুদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে। এর প্রধানত দুটি ধারা। একটি হল ভারতীয়দের দৈহিক সমতা ও বিভিন্নতা নির্ণয়, অন্যটি তাদের জাতিতত্ত্ব নির্ণয়। রিজ্‌লেই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ধারায় জাতিতত্ত্ব চর্চা শুরু করেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের দৈহিক মাপজোখ সংগ্রহ করেন। এই মাপজোখের উপর নির্ভর করে তিনি ভারতবাসীকে সাতটি জাতিগোষ্ঠীতে ভাগ করেন। অবশ্য পরবর্তীকালে ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ ভারতবাসীদের দুটি প্রধান এবং তিনটি অপ্রধান জাতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

নৃতত্ত্ব চর্চার কেন্দ্র

ভারতবর্ষে নৃতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে ভারতীয় নৃতত্ত্ব সমীক্ষা বা অ্যান্থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া নানা ধরনের উল্লেখযোগ্য কাজ করে আসছে বহুদিন ধরে। এছাড়া নৃতত্ত্ব চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিভাগটি শুরু হয়েছে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে শিক্ষাবিদ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে। এখানে নৃতত্ত্বের বিভিন্ন শাখা, যথা প্রাগৈতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, দৈহিক প্রভৃতি শাখা সম্বন্ধে এখানে পড়ানো ও গবেষণার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া ভারতবর্ষের আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিষয়ে পড়ানো ও গবেষণার ব্যবস্থা রয়েছে।

ভারতে নৃতাত্ত্বিক নিদর্শনের বৃহৎ সংগ্রহ দেখা যায় কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে। তাছাড়া দিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালা এবং মাদ্রাজের সরকারি সংগ্রহশালায় নৃতত্ত্ব-বিষয়ের অপূর্ব সব নিদর্শন দেখবার মত।

ভারতের জাতি পরিচয়

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। বহু জাতি উপজাতির বাস এখানে। কত বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রা এ-সব মানুষের। তা-ছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে আদিম অধিবাসীরা বাস করেন তাঁদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। অগণিত ভারতবাসীর সামগ্রিক মঙ্গলের জন্যেই আমাদের দেশে নৃতত্ত্বের চর্চার একান্ত প্রয়োজন। আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যথাযথ রক্ষা করে তাদের উন্নতিতে নানাভাবে সাহায্য করে নৃতত্ত্ব। এর ফলে শিক্ষা-প্রসার ও নাগরিক সভ্যতার প্রভাব গ্রামের লোকদের উপর কিভাবে পড়বে তা বুঝে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সার্থক প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। এ কাজেও নৃতত্ত্ব আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে। ভারতের নানা উপজাতি সম্বন্ধে

বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ভেরিয়ার এলউইন যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করবার মত।

ভারতের নানা জাতি সম্বন্ধে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদ রিজ্‌লে যে চমৎকার আলোচনা করেছেন সে-কথার উল্লেখও করা হয়েছে। রিজ্‌লে ভারতবাসীদের কয়েকটি সাধারণভাগে ভাগ করেছেন।

ভারতের প্রধান প্রধান জাতিগুলির কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই আমরা দ্রাবিড় জাতির কথা বলছি। ভারতের দক্ষিণ অংশ, মধ্যপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চল এবং ছোটনাগপুর অঞ্চলে দ্রাবিড় জাতির বাস। এদের চোখ এবং গায়ের রঙ কালো, দেহে আছে প্রচুর কোঁকড়ানো লোম। এদের গোঁফ দাড়ি আছে। উচ্চতা এদের কম, মাথা লম্বা ধরনের, নাক চওড়া ও নাকের গোড়া বেশ দাবানো। পাঞ্জাব, রাজস্থান, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদের ইন্দো-এরিয়ান বা ভারতীয় আর্যজাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বেশ ফর্সা রঙ, কালো চোখ, টিকোলো নাক, লম্বা মাথা এবং ঢ্যাঙা গড়ন এদের সহজেই চিনিয়ে দেয়। আবার রাজস্থানের কোন-কোন অঞ্চল, উত্তর প্রদেশ ও বিহারে আর্য ও দ্রাবিড়জাতির মিশ্রণে গড়ে ওঠা একটি মিশ্রজাতির পরিচয় পাওয়া যায়। এদের মাথার খুলির গঠন সাধারণত লম্বা ধরনের হলেও লম্বা মাথা এবং চওড়া মাথার মাঝামাঝি ধরনের মাথাওয়ালা লোকও এদের মধ্যে দেখা যায়। এদের গায়ের রঙ ফিকে তাম্রাভ থেকে কালো, নাক মাঝারি ধরনের।

গুজরাটের সৌরাস্ট্র, মহারাস্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূরের কুর্গ অঞ্চলে বাস করে দ্রাবিড় ও সীদিয়ান জাতির মিশ্রণে গড়ে ওঠা একটি মিশ্র জাতি। সীদিয়ানরা হল মধ্য-এশিয়ার জাতি। দ্রাবিড়-সীদিয়ান মিশ্র জাতির লোকেদের রঙ ফর্সা, মাথা চওড়া, মাঝারি ধরনের নাক। লম্বায় এরা মাঝামাঝি ধরনের। আসাম সমেত হিমালয়ের পাহাড়ি অঞ্চল এবং অধিত্যকায়

(নেপালেও) বাস মঙ্গোলীয় জাতির লোকদের। এদের মাথা চওড়া, চোখের কোণ মোড়া, গায়ের রঙ হলদে থেকে কালচে, গায়ে লোম কম, দেহ খর্বাকৃতি। ভারত উপমহাদেশের (বর্তমানে পাকিস্থানের) বালুচিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোকদের জাতির নাম দেওয়া হয়েছে তুর্ক ইরাণীয় জাতি।

এবারে শোন বাঙালী জাতির পরিচয়। রিজ্‌লে সাহেবের মতে মঙ্গোলীয় এবং দ্রাবিড়দের মিশ্রণে তৈরি জাতির সঙ্গে আর্যদের বেশ কয়েকটি ধারা মিশেই সৃষ্টি করেছে বাঙালী জাতি। এদের গায়ের রঙ সাধারণত কালো, মাথার খুলি গোল, মুখে গোঁফ দাড়ির প্রাচুর্য, নাক মাঝারি এবং দেহের উচ্চতা মাঝামাঝি।

জাতি, ধর্ম ও ভাষা

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল। আমরা এখানে ভারতের লোকদের ধর্ম হিসেবে জাতির কথা বলছি না। ধর্মের জাতি আর নৃতত্ত্বের জাতির মধ্যে কিন্তু কোন সম্পর্কই নেই। নৃতত্ত্ব কেবল দেহলক্ষণের কথাই বলছে। এও দেখা যায় যে, বিভিন্ন জাতি লক্ষণের লোকেরা বহুদিন একসঙ্গে বসবাস করার ফলে হয়ত এমন-ভাবে গড়ে উঠেছে যাতে করে তাদের ভাষা হয়ে গেছে এক। সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে একই ধরনের।

বাঙালী জাতি পুরোপুরি অর্থে আর্য না হয়েও আর্যগোষ্ঠীর একটি ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন বাংলা ভাষায় কথা বলে। বাঙালীদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম প্রচলিত থাকলেও সংস্কৃতি ও ভাষার দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় যে, বাঙালী একটি সম্পূর্ণ জাতিগোষ্ঠী।

আদিবাসীদের পরিচয়

ভারতে আদিবাসীদের সংখ্যা প্রচুর। এরা সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নানা কারণের জন্যে সাধারণ ভারতীয়দের মত

অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিকে তেমনটা অগ্রসর হতে পারেন নি। কিন্তু নাগরিক সভ্যতার বাইরে গ্রামে নিজ গোষ্ঠীর সহজ সুন্দর সমাজে এরা ভারতীয় সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে একটি সুন্দর ভাবধারা রক্ষা করে আসছেন। এদের জীবন-ধারা, নাচ গান, শিল্পকলা, উপকথা, সামাজিক নিয়ম'কানুন প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচনা করার দাবি রাখে।

ভারতের উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব হিমালয় এবং পূর্ব সীমান্তের আদিবাসীদের ভাষা হল তিব্বতীয়-চৈনিক (ভোট চীন) এবং তিব্বতীয় ব্রহ্ম (ভোট ব্রহ্ম)। এদের দেহলক্ষণ মঙ্গোলীয়। মিশ্‌মি, আবর, মিকির, দাফলা উপজাতি, অঙ্গামি, সেমা, আও প্রভৃতি নাগা জাতির লোক, খাসি, লেপচা, কুকি প্রভৃতি উপজাতি এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে মণিপুরের অধিবাসী মৈথেই বা মণিপুরীরা ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রসর।

নর্মদা থেকে গোদাবরী অঞ্চলেও বহু আদিবাসীর বাস। উড়িষ্যা, বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল, মধ্যভারতের দক্ষিণে বসবাসকারী আদিবাসীদের মধ্যে খোন্দ, ভূমিজ, মুণ্ডা, ওঁরাও, বীরহোড়, কোল, ভীল প্রভৃতি জাতির নাম করা যেতে পারে। তবে সংখ্যার দিক দিয়ে মধ্যপ্রদেশের গোণ্ড এবং বিহার-বাংলার সাঁওতাল গোষ্ঠী সবচেয়ে বড়। উন্নতিতে সাঁওতালরাই সকলের চেয়ে অগ্রসর বলা চলে। এদের মধ্যে কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতিরা যে ভাষায় কথা বলে তার নাম অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা। এদের ভাষা দ্বারা বাংলা প্রভৃতি বহু ভাষার উচ্চারণ-রীতি ও শব্দ-সম্ভার প্রভাবিত হয়েছে। গোণ্ড প্রভৃতি উপজাতিদের ভাষা হল দ্রাবিড়ীয় উপভাষা।

দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম ঘাট, নীলগিরি, ওয়াইনাদ প্রভৃতি অঞ্চলে, মহীশূর ও অন্ধ্রে নানা আদিবাসীর বাস। এদের মধ্যে পাহাড়ি চেঞ্চু, কাদার, কনিক্কার, ইরুলা প্রভৃতি উপজাতিগুলি খাদ্য-সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। চাষবাসের প্রচলন এদের মধ্যে

নেই বললেই চলে। নীলগিরির টোডা, বাদাগা, ওয়াইনাদের কুরিচিয়া, চেট্টি, মুল্লা কুরুম্বার, উরালি কুরুম্বার ; অন্ধ্রের গাদাবা, শবর প্রভৃতি উপজাতিগুলির নাম উল্লেখ করবার মত। এদের ভাষা হল দ্রাবিড় ভাষা-গোষ্ঠী—যেমন, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালম্ প্রভৃতির অনুরূপ দ্রাবিড়ীয় উপভাষা।

সম্প্রতিকালে আন্দামান দ্বীপের অঙ্গি, জারোয়া প্রভৃতিদের সম্বন্ধেও বহু আলোচনা হয়েছে। এরা নেগ্রিটো বা নিগ্রো জাতি-গোষ্ঠীর লোক।

ভারতের উপজাতিদের সামাজিক অবস্থা আলাদা আলাদা। খাদ্য-সংগ্রহ থেকে উন্নত চাষবাস, মাতৃতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক পরিবার-ব্যবস্থা, নানান ধরনের গোষ্ঠীগত আইন কানুন, নানা রকমের অপূর্ব সব শিল্পকলা এদের মধ্যে দেখা যায়। তবে এদের জীবনে ক্রমাগত প্রভাব পড়ছে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্কৃতির।

ভারতীয় জীবনধারায় আদিবাসীদের দানও নিতান্ত কম নয়।

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
BANIPUR

বিজ্ঞান চেতনা ৬

প্রত্নতত্ত্বের কথা

সন্তোষ বসু

সংশোধন করে নাও

প্রত্নতত্ত্বের কথা

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
৭	২	মানুষের তৈরি	মানুষেরা পাথরের তৈরি
৮	১৬	হিয়েরোগ্রিফ্	হিয়েরোগ্লিফ্
১১	৯	ফারাও আন্থ্-আমেন	ফারাও তুত্-আন্থ -আমেন্
১১	১৯	উগরাগেত্	উগারিত
১৭	১৩	ছায়া পড়ে। বৃত্তাকার সমাধি-আয়তাকার	ছায়া পড়ে বৃত্তাকার সমাধি-ও আয়তাকার
২১	৭	হাইনরিত্ স্লীম্যানের	হাইনরিখ্ স্লীমান-এর
২১	৯/১৮	স্লীম্যান	স্লীমান
৫০	১৭	মাস্তারা	মাস্তাবা
৫৫	২৩/২৪	'মোডন ক্যাস্ল্'	'মেডেন কাস্ল্'
৫৬	১০	জানুদেশে	সানুদেশে
৬২	১৪	হাত্তসাসে	হাত্তুসাস-এ



স্যর ডব্লিউ. এম. ফ্লিণ্ডার্স্ পেট্রি

১

গোড়ার কথা

প্রত্নতত্ত্ব বিষয়টা কী

প্রাচীনকালের কথা ও কাহিনী কে না ভালবাসে? ছোটবেলায় গল্পের ভিতর দিয়ে বাবা-মা, ঠাকুমা-দিদিমা ও ঠাকুরদা-দাদামশায়ের মুখে আমাদের পারিবারিক ইতিহাস জানতে পারি আমরা। এভাবে জানার জন্যে তেমন কোন অসুবিধে হয় না। কারণ কোন পরিবারে যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁদের অনেকেই ঠাকুরদা-দিদিমাদের বা তাঁদের আগের পুরুষের অনেককেই সাক্ষাৎভাবে দেখেছেন এবং তাঁদের মুখে পরিবারের নানা কথা শুনেছেন। এভাবে একশো দেড়শো বছরের খবর অনায়াসেই জানা যায়। মুদ্রিত বই, খবরের কাগজের পুরোনো সংখ্যা প্রভৃতিও এ ব্যাপারে খুব সাহায্য করে। তাছাড়া একশো দেড়শো বছর আগেকার ঘরবাড়ি, জিনিসপত্র, টাকা পয়সা বা বেশভূষাও তেমন কিছু দুর্লভ নয়। তবে, এভাবে চার পাঁচশো বছর আগেকার ইতিহাস জানতে গেলে নানা অসুবিধে দেখা দেয়, কারণ লিখিত প্রমাণের অভাব এসে দেখা দেয় এ-কাজের জন্যে। কিন্তু আমরা যদি এক হাজার বা দু-হাজার বছর আগেকার ইতিহাস জানতে চাই তবে কাজটা যে বেশ কঠিন হয়ে পড়ে তা না বললেও বুঝতে পার তোমরা। কঠিন হলেও কাজটা যে অসম্ভব নয় তা বলাই বাহুল্য। এ-সব কাজের জন্যে আমাদের নির্ভর করতে হয় সেকালকার রাজা-মহারাজাদের শিলালিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা বা মুদ্রাঙ্ক, সমাধি, স্মৃতিসৌধ প্রভৃতির উপর। তাছাড়া বহুদিন থেকে চলে আসা কাব্য-পুরাণ, লোকগাথা প্রভৃতিও এ কাজে নানাভাবে সাহায্য করে। সেকালকার ভাষা, অক্ষর, নগর-বন্দর, রাস্তা-ঘাট, ঘরবাড়ি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করাও অসম্ভব

নয়, কারণ সেকালকার অনেক কিছুই একটু একটু বদলে আধুনিক রূপ পেয়েছে।

মানুষের সভ্যতায় লেখার আবিষ্কার মাত্র পাঁচ-ছয় হাজার বছরের পুরোনো। একেবারে প্রথমদিককার লিপি এবং ভাষার মানে বুঝে ওঠা সহজ নয়। বহু পরিশ্রম এবং গবেষণার পর প্রাচীন কালের নানা ধরনের লেখার মানে বোঝা সম্ভব হয়েছে। সভ্যতার প্রথম যুগের অজানা নগর, বন্দর প্রভৃতির অবস্থানও নির্ণয় করতে হয় নানা রকমের বৈজ্ঞানিক উপায়ের সাহায্য নিয়ে।

কিন্তু আমরা যদি এরও আগেকার, অর্থাৎ পাঁচ ছয় লক্ষ বছর আগেকার মানুষের জীবনধারা জানতে চাই তবে ভাষা বা লিপির সাহায্যও পাওয়া যাবে না। সে সময়কার ইতিহাস জানতে হলে সেকালকার মানুষের দেহাবশেষ, তাদের ব্যবহার-করা অস্ত্রশস্ত্র, তৈজসপত্র প্রভৃতির খোঁজে বেরোতে হবে আমাদের। কাজটি মোটেই সহজ নয়। এর জন্যে দরকার ভূ-বিদ্যা, নৃতত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, গণিত, রসায়ন-বিদ্যা—এক কথায়, বিজ্ঞানের সকল শাখার সাহায্য।

প্রাচীন কালের কথা জানবার এই বৈজ্ঞানিক কর্মকৌশল এবং তা থেকে আসা নানা সিদ্ধান্তকেই বলা হয় প্রত্নতত্ত্ব বা পুরাতত্ত্ব। সহজেই বুঝতে পারছ বিষয়টা কত বিরাট, কত ব্যাপক তার পরিধি! পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের সময় থেকে শুরু করে পাঁচ ছয় লক্ষ বছরের ধারাবাহিক ইতিহাসকেই আমরা প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে ফেলতে পারি। আগেই বলেছি, লিপি বা ভাষা আবিষ্কার কিছুটা পরবর্তী-কালের ঘটনা। তাছাড়া লিপির আবিষ্কার আবার সব দেশে একই সময়ে হয় নি। এমন অনেক প্রাচীন সভ্যতার খোঁজ পাওয়া গেছে যেখানে লিপির আবিষ্কার হয়েছে বহু পরে। তা-ছাড়া লিপি আবিষ্কার একদম হয় নি এমন প্রাচীন সভ্যতার সন্ধানও পাওয়া গেছে পৃথিবীর কোন-কোন অংশে। লিপির সাহায্য নিয়ে প্রাচীন

সভ্যতার ইতিহাস জানতে গিয়ে একটা বড় রকমের অসুবিধে দেখা যায় অনেক সময়। লিখিত বিবরণের মধ্যে একপেশে ভাব থাকা অসম্ভব নয়; কারণ কোন রাজার সভাকবি বা পণ্ডিতেরা আপন রাজার সম্বন্ধে কিছুটা বাড়িয়ে বলার চেষ্টা যে করবেন না এমন কোন কথা নেই। তা-ছাড়া পণ্ডিত এবং দার্শনিকরা নিজ-নিজ মতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকবেন। এ-সব কারণের জন্যে শিলালিপি এবং তাম্রশাসনে প্রায় সব ক্ষেত্রেই অত্যুক্তি এবং অহেতুক দম্ভের প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে যে বিবরণ পাওয়া যায় তার মধ্যে একপেশে ভাব না থাকারই কথা। আমরা এক কথায় বলতে পারি, প্রাচীন দিনের একটা পুরোপুরি ছবি দেওয়াই প্রত্নতত্ত্বের আসল কাজ।

কী করে গড়ে উঠল প্রত্নতত্ত্ব

প্রত্নতত্ত্বের উৎপত্তি হল কিভাবে? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত বহু দিনের বহু কর্মীর অক্লান্ত চেষ্টায়ই গড়ে উঠেছে আধুনিক পুরাতত্ত্ব। অবশ্য কতগুলি সামাজিক এবং ঐতিহাসিক কারণই রয়েছে এর মূলে। এখন থেকে চার পাঁচ-শো বছর আগে ইউরোপের নানা স্থানে, বিশেষ করে ইটালি এবং গ্রীস দেশে শহর এবং নগর গড়তে গিয়ে মাটির তলা থেকে অতি সুন্দর সব পাথরের মূর্তি বেরিয়ে পড়ে। তাছাড়া প্রাচীন রোম ও গ্রীক সভ্যতার অনেক প্রাসাদ, মন্দির এবং স্মৃতি-সৌধের দিকেও লোকের দৃষ্টি পড়ে। প্রাচীন গ্রীস এবং রোম সেকালে সভ্য জগতে বিশেষ স্থানের অধিকারী ছিল। প্রাচীন গ্রীক ভাষা, তার শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির দিকেও লোকের নতুন করে দৃষ্টি পড়ে। ধনীরা প্রাচীন দ্রব্য-সামগ্রীর সংগ্রহ গড়ে তোলেন। এমনিভাবেই উৎপত্তি হয় প্রথম পুরাবিদ্যার। অবশ্য এ ব্যাপারের মূলে ছিল শিল্প, সাহিত্য এবং ইতিহাসের অনুপ্রেরণা।

বিজ্ঞানের স্পর্শ তেমনটি ছিল না। এ সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটা স্বতন্ত্র সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে থাকে। তার ফলে সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ডে আপন-আপন জাতীয় ইতিহাস জানবার আগ্রহ জাগে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভূতত্ত্ব এবং প্রাণীবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তা-ছাড়া ব্যবসা এবং সাম্রাজ্যের লোভে ইউরোপের নানা জাতি আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার নানা জাতির লোকেদের সংস্পর্শে আসেন। এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নানারকম সমাজ-ব্যবস্থা, জন্তুজানোয়ারের দেহ-গঠন, মানুষের ভাষা ও লিপির একটা তুলনামূলক আলোচনা করার প্রবণতা দেখা যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রোম, ফ্লোরেন্স, নেপল্‌স্‌, প্যারি এবং লণ্ডনে নানারকমের বৈজ্ঞানিক সমিতি গড়ে ওঠে। প্রাচীনকালের অধি-বাসীদের জানবার জন্যে ইউরোপ থেকে বহু ভ্রমণকারী পশ্চিম এশিয়া এবং গ্রীস দেশ প্রভৃতি ভ্রমণ করে চিত্রিত ভ্রমণ-কাহিনী রচনা করতে থাকেন। তাঁরা প্রাচীন কালের যে-সব দ্রব্য-সামগ্রী জোগাড় করেছেন তা দিয়ে গড়ে উঠল সুন্দর-সুন্দর সব সংগ্রহশালা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নেপোলিয়ন মিশর অভিযান করেছিলেন; এর ফলে পণ্ডিতেরা মিশরের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হন। তা-ছাড়া পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন নগর-সভ্যতার দিকেও এঁদের দৃষ্টি পড়ে। উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম-ইউরোপের নানা জায়গা থেকে প্রাচীন মানুষের ব্যবহৃত পাথর এবং ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হয়। প্রথমদিকে অবশ্য পাথরের অস্ত্রগুলির প্রকৃতি বুঝে ওঠা সম্ভব হয় নি। সাধারণ লোক এ-সব পাথুরে অস্ত্রশস্ত্রকে বজ্র-পাথর এবং ওষুধের গুণসম্পন্ন পাথর বলেই মনে করত। অবশ্য ভ্যাটিকান উদ্যানের সংরক্ষক মারক্যাটি বলে এক পণ্ডিত ব্যক্তি অনেকদিন আগেই অনুমান করেছিলেন যে, ইউরোপের প্রাচীন অধিবাসীরা

পাথরে তৈরি কুঠার ব্যবহার করত। ইংল্যাণ্ড এবং অন্যান্য দেশের পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেন যে, প্রাচীন মানুষের তৈরি কুঠারই ব্যবহার করত নানা কাজের জন্যে। আজ আমরা লোহার তৈরি কুঠার ব্যবহার করি কাটাকুটির কাজে। সেকালের লোকেরা লোহার ব্যবহার জানত না বলেই এই ব্যবস্থা।

জার্মানিতে জুরা নামে একটা পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের একটি প্রাচীন গুহায় ভাল্লুক এবং অতি প্রাচীন প্রাণীর হাড়গোড়ের সঙ্গে মানুষের হাড়েরও সন্ধান পাওয়া যায়। ইংল্যাণ্ডের জন ফ্রার নামে এক পণ্ডিত ব্যক্তির নাম এ-সব ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখ করবার মত। পণ্ডিতদের এ-সব কথা সেকালে যে বিশেষ কল্‌কে পেয়েছে সমাজে তা অবশ্য নয়। খ্রীস্টধর্মের গোঁড়ামিই রয়েছে এর মূলে।

এরপর জেম্‌স্‌ হাটন নামে এক ইংরেজ পণ্ডিত বলেন যে, শিলাস্তরের বিন্যাস নির্ভর করে মাটির উপরকার প্রাকৃতিক পরিবর্তনের উপরেই। তার মানে, ভূমিকম্প, সমুদ্র-তরঙ্গ, নদীপ্রবাহ এবং হিমবাহই ভূ-প্রকৃতির বিবর্তনের প্রধান কারণ। কোনরকম অলৌকিক বা জাদুমন্ত্রের বলে পৃথিবীর ভূ-প্রকৃতির সৃষ্টি হয় নি। পাথরের স্তরের ভিতরকার প্রস্তরীভূত হাড় বা জীবাশ্মের সাহায্যে ভূ-স্তরের বয়স বের করবার উপায় আবিষ্কৃত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

ডেনমার্কের জাতীয় সংগ্রহশালায় প্রচুর প্রাচীন সামগ্রী আছে। এখানকার রক্ষক ক্রিশ্চিয়ান জুরগেনসেন থমসেন সংগ্রহশালার দ্রব্য-সামগ্রী সে-সব তৈরির উপাদান হিসেবে ভাগ করেন। তিনি বলেন, প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনগুলি পাথরের, ব্রোঞ্জের এবং লোহার এই তিনটি ভাগে ভাগ করে রাখা উচিত। তাঁর মতে প্রাগৈতিহাসিক কালকে তিনটি যুগে ভাগ করা দরকার—প্রস্তর-যুগ, ব্রোঞ্জ-যুগ এবং লৌহ-যুগ। থমসেনের এ মতটি ইউরোপের নানা স্থানে বিশেষ স্বীকৃতি পায়। এরপর প্রস্তর যুগের সময়টিকেও

দুটি আলাদা ভাগে ভাগ করা হল—প্রাচীন প্রস্তর যুগ এবং নব্য প্রস্তর যুগ। পাথরের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য সামগ্রীর আকারের মসৃণতা ও গঠন হিসেবেই এ কাজটি করা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন দেশে পণ্ডিতদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অনুসন্ধানের ফলে প্রত্নতত্ত্বের নানা রহস্য উদ্ঘাটিত হতে থাকে। ফরাসী ও স্পেন দেশের গুহায় প্রস্তর-যুগের অপূর্ব সব চিত্রকলা আবিষ্কৃত হয়। ইতিমধ্যে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ডারউইন তাঁর বিবর্তনবাদ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে বিভিন্ন পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে মানুষের বর্তমান দৈহিক এবং মানসিক গঠনের সৃষ্টি হয়েছে। বাইসন, ম্যামথ, দাঁতাল বাঘ প্রভৃতির হাড়ের সঙ্গে প্রাচীন মানুষের কঙ্কালের আবিষ্কারও এ-সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

পশ্চিম-এশিয়া এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কার করারও চেষ্টা চলতে থাকে। নেপোলিয়নের সঙ্গে আসা এক প্রত্নতাত্ত্বিক আলেকজান্দ্রিয়ার নিকটে একটি জায়গার মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করেন প্রাচীন মিশরের ডিমোটিক, হিয়েরোগ্রিফ এবং গ্রীক ভাষায় লেখা একটা ফলক। ফলকটি কালো পাথরের তৈরি। প্রাচীন মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধার করা বিশেষ শক্ত। ডি স্যসী, একর ব্লাড, ইয়ং এবং বিশেষ করে ফরাসী পণ্ডিত শাঁপোলিয়ন প্রভৃতি পণ্ডিতদের চেষ্টায় এ কাজটি সম্ভব হল। মিশর দেশের নানা জায়গায় অনুসন্ধান এবং মাটি খোঁড়ার কাজ চলতে থাকল। অ্যাসিরীয় রাজাদের প্রাসাদ এবং ওয়ারকা নামে একটি শহর আবিষ্কার করা হল। এদিকে পারস্য দেশের একটি পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা পারস্য-সম্রাট দারিয়ুসের উৎকীর্ণ প্রাচীন পারসিক এবং কোণক লিপির সন্ধান পাওয়া যায়। মিশরের অন্যান্য স্থানে যে বিপুল পরিমাণে অনুসন্ধান-কার্য চলেছে তার ফলে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার পূর্ণ স্বরূপটি ধরা পড়েছে আমাদের কাছে।

প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার স্বরূপটিও আমাদের আজ অজানা নেই। তুর্কি দেশের প্রাচীন হিটাহিট জাতির কথা, ক্রীট দ্বীপের মিনোয়ান সভ্যতার ইতিবৃত্ত, ব্যাবিলনীয় সভ্যতার গোড়ার কথা, সবই একে-একে আমরা জানতে পেরেছি প্রত্নতাত্ত্বিকদের অদম্য উৎসাহ এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলে। এ ছাড়া উত্তর ও মধ্য-আমেরিকা, দক্ষিণ ও পূর্ব-আফ্রিকা এবং ভারতেও প্রচুর অনুসন্ধান-কার্য চলেছে এবং এ-সব দেশের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

কিভাবে চলে অনুসন্ধানের কাজ

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কার্য চালাতে হলে কতগুলি বিশেষ ধরনের পদ্ধতি ও কর্মকৌশলের সাহায্য নিতে হয়। বলা বাহুল্য এ-সবের জন্যে চাই বিশেষ ধরনের শিক্ষা। অনুসন্ধানের কাজে যে-সব পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয় সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু বলে রাখা ভাল যে, বিভিন্ন ধরনের উপায়ের মধ্যে খনন-কার্য হল প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রধান হাতিয়ার। নিখুঁত-ভাবে খনন-কার্য পরিচালনা না করতে পারলে অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্যের সম্ভাবনা কম। যেমন-তেমন ভাবে যেখানে খুশি খনন-কার্য চালিয়ে আশানুরূপ ফল লাভ করা সম্ভব নয়। তা-ছাড়া অনেকের ধারণা যে, কেবল বিশেষ ধরনের মূল্যবান সামগ্রীটিই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় বিশেষ কাজে লাগে। এ ধারণা একেবারেই ভুল। খনন-কালে যে-কোন জিনিসই পাওয়া যাক না কেন এবং তা যত সামান্যই হোক না কেন, প্রকৃত প্রত্নতাত্ত্বিকের নিকট তার মূল্য যথেষ্ট।

এ সম্বন্ধে ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি নামে এক ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিকের মত বিশেষ মূল্যবান। তিনি বলেন, 'খননের সময় প্রত্ননিদর্শনের কোন-রকম ক্ষতি করা চলবে না। প্রত্যেকটি জিনিস অতি সাবধানে

সংগ্রহ করে তার লিখিত এবং চিত্রিত বিবরণ দিতে হবে। প্রাচীনকালের ঘরবাড়ি এবং প্রাসাদাদির নিখুঁত ভিত্তি সংস্থান করাতে হবে। প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সাহায্য করতে হবে'।

উনবিংশ শতাব্দীর যে-সব আবিষ্কারের কথা আমরা আগেই বলেছি তার সব জায়গায়ই যে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে খনন-কার্য চলেছে তা অবশ্য বলা যায় না। এমন অনেক প্রত্নতাত্ত্বিকের সন্ধান আমরা পাই যাঁরা যেন তেন প্রকারেণ সবচেয়ে বেশি চমকপ্রদ জিনিস খুঁজে বের করতে পারলেই নিজেরা খুশি হতেন। এমনও দেখা গেছে যে, একই টিবির বিভিন্ন অংশে কোনরকমে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চালানো হত। তা-ছাড়া খনন-কার্য সম্পূর্ণ না করেই চলে যাওয়া হত অনেক সময়ে। প্রাচীন প্রাসাদের গা থেকে মূর্তি ও কারুকার্য ভেঙে খুলে নেওয়া হত। অতি-উৎসাহী ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া এমন কাজ যে কেউ করেন না তা বলাই বাহুল্য।

খনন-কার্যের সবরকম উন্নতি এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে এ কাজ করার ব্যাপারে ইটালি, জার্মানি এবং ইংল্যাণ্ডের কয়েকজন প্রত্নবিদের নাম বিশেষ উল্লেখ করবার মত। খনন-কার্যের সময় স্থপতি এবং আলোকচিত্র-শিল্পীর সাহায্য নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

প্রত্নতত্ত্ব—বিংশ শতাব্দীতে

প্রত্নতত্ত্বের সবচেয়ে উন্নতি হয় বিংশ শতাব্দীতে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, প্রস্তর-যুগের সংস্কৃতিকে শুধুমাত্র ভূতাত্ত্বিক উপায়ে ভাগ করা চলে না। তাই প্রাচীন প্রস্তর-যুগকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়—প্রাচীন, মধ্য এবং পরবর্তী। তা-ছাড়া ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ব ক্রমে-ক্রমে পূর্ব-ইউরোপ এবং

দক্ষিণ রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এ-সব জায়গা থেকে প্রাচীন সভ্যতার নতুন নতুন কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক চাইল্ড এবং হক্‌স্‌-এর লিখিত বইগুলি থেকে ইউ-রোপের একটি পূর্ণ চিত্র আমরা পেতে পারি।

ক্রীট এবং তার নিকটস্থ অঞ্চলে প্রাচীন মিনোয়ান সভ্যতার আবিষ্কার সভ্য জগতকে বিস্মিত করে দেয়। এ ব্যাপারে যিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন তাঁর নাম হল আর্থার ইভান্স। মিশরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে বহু প্রাচীন নিদর্শন। ফারাও আনখ্‌ আমেনের সমাধি আবিষ্কার করা সম্ভব হল। তাছাড়া ফায়ুম, বদরি, তাসা প্রভৃতি স্থানে ফারাওদেরও আগেকার এক তাম্র-প্রস্তরীয় সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইরাকের বহু অঞ্চলে ব্যাবিলন, আসুর, উর, উরুক, এরিডু প্রভৃতি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করা সম্ভব হল।

পারস্য দেশে যে প্রত্নতত্ত্বের চর্চা এবং অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয় তা বিংশ শতাব্দীতেই। সুসা, শাহটিপি, টিপি হিসার, টিপি গিয়ান প্রভৃতি জায়গা থেকে প্রাচীন কালের অপূর্ব সব মৃৎপাত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। তুর্কি দেশের প্রাচীন হিটাইট জাতিদের কথা এবং তারও আগেকার সভ্যতার কথা জানা সম্ভব হল এ সময়ে। প্যালেস্টাইনের জেরিকো শহর এবং সিরিয়ার উগরাগেত নগরের আবিষ্কারও এ সময়ের কাজ।

বিংশ শতাব্দীর আর-একটি প্রধান কাজ হল চীনদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। হোনান প্রদেশ থেকে নব্য-প্রস্তর যুগের সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন শাঙ বংশের রাজধানী আনিয়াং থেকে প্রথম ব্রোঞ্জ-ব্যবহারকারী এক সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন প্রস্তর-যুগের নিদর্শন এবং পিকিং মানুষের সন্ধানের কাজও এ সময়ে চলে।

আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর অনুসন্ধানের কাজ চলে। পূর্ব-

আফ্রিকায় অনুসন্ধানের কাজ চালান যে-সব পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁদের মধ্যে ওয়েল্যাণ্ড এবং লিকির নাম বিশেষ খ্যাত। দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকেও প্রস্তর-যুগের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। আমেরিকার প্রস্তর-যুগের সংস্কৃতি, বলিভিয়া ও মধ্য-আমেরিকার মায়া, টোল-টেক, অ্যাজটেক প্রভৃতি সভ্যতার সময় নির্ধারণের কাজও বর্তমান শতাব্দীর দান। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রস্তর-যুগের সংস্কৃতি-বিষয়ে আলোচনা ও অনুসন্ধানের কাজও এ-সময়ে হয়েছিল।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতে সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কার প্রত্নতত্ত্ব জগতে একটি চমকপ্রদ ঘটনা। এ আবিষ্কারের ফলে আজ আমরা বলতে পারি যে, ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন। কাশ্মীর, মধ্য-ভারত এবং দক্ষিণ-ভারতে প্রস্তর-যুগের বহু আবিষ্কারও বিভিন্ন সময়ে হয়েছে।

প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে আমরা আজ বলতে পারি যে, সত্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে, তবেই পুরোনো দিনের কথাকে প্রকাশ করা যাবে সুন্দরভাবে, যথাযথভাবে। প্রাচীন নিদর্শনের প্রতিটির আকার, গড়ন, বিশেষ আকৃতি ও সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে প্রথমে খোঁজ-খবর নিতে হবে। তারপর একই গোষ্ঠীর বা একই স্থানের দ্রব্য-সামগ্রী বিচার করে তৎকালীন অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সন্ধান নিতে হবে। তাই প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং চিন্তাধারার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই নতুন বিষয়টি আজ সম্পূর্ণরূপে যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। কাজেই নানা দিক দিয়ে বিচার করে প্রত্নতত্ত্বকে আজ আমরা সাধারণ বিজ্ঞানের অন্যতম বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। তা ছাড়া বিজ্ঞানের বিশেষ-বিশেষ শাখার সাহায্য না নিয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অনুসন্ধানের কাজ চলতে পারে না আজ কোনক্রমেই।

২

আবিষ্কারের সূত্র

প্রাচীন কালের সভ্যতার নিদর্শন কোন্‌খানে? কোথায় এর সন্ধান পাওয়া যাবে? কী করে বুঝব যে অমুক দেশের একটা বিশেষ জায়গায় মাটির নিচে, লোকচক্ষুর অন্তরালে অতীতের ঘরবাড়ি, কাঠকুটো, জিনিসপত্র লুকিয়ে আছে? প্রশ্নগুলি মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রত্নতাত্ত্বিকদের নানা ধরনের আবিষ্কারের কথা পড়লে তাঁদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। মনে হয়, তাঁরা যেন জাদুবিদ্যার সাহায্যেই 'এইখানে' 'ওইখানে' বলে নির্দেশ করছেন, আর সে-সব স্থানের মাটি খুঁড়লেই অদ্ভুত-অদ্ভুত সব জিনিস বেরিয়ে আসছে।

কিন্তু আদতে প্রত্ন-অনুসন্ধানের মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। বিজ্ঞানের অন্য সব বিষয়ের মত প্রাচীনকালের রহস্য উদ্‌ঘাটন-কারীদেরও সমস্ত জিনিসকে খুঁটিয়ে দেখার, আর কিসের জন্যে পরিবর্তন হচ্ছে কেন হচ্ছে, এইসব যাচিয়ে নেওয়ার একটা অভ্যাস করতে হয়। হয়ত তাড়াতাড়ি করে চোখ বোলালে কোন কিছুই আমাদের চোখে পড়বে না, কিন্তু একটু খুঁজে-পেতে বিচার করলে আমরা সাধারণ সব দৃশ্য, নানা ঘটনা অথবা কাহিনী থেকেও প্রাচীন দিনের খবর নেওয়ার সূত্র পেয়ে যেতে পারি। মানুষ সব সময়েই জীবনযাত্রার সুবিধে হবে এইরকম একটা স্থান ঠিক করে নেয় বসবাস করবার জন্যে। যে-কোন রকমের একটা জায়গাই মানুষের থাকবার পক্ষে সুবিধেজনক হয় না। আর, একবার যেখানে মানুষের বাস হয়েছে সেখানে মানুষের তৈরি কোন-না-কোন চিহ্ন থাকবেই। রোদ, জল, ঝড়, বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও বন্যার তোড়ও অনেক সময়ে সম্পূর্ণ অভাবিতভাবে আমাদের অতীত সভ্যতার সন্ধান পেতে সাহায্য করে। মরুভূমির উত্তাপ,

তুষারের শৈত্য, সমুদ্রের তরঙ্গ—এ-সবও নানাভাবে সাহায্য করে আমাদের। বর্তমান কালের মানুষের খোঁড়াখুঁড়ির কাজকর্ম, নগর, বন্দর, পুস্করিণী, জলনালী প্রভৃতি তৈরি করবার সময়েও প্রাচীন কালের নিদর্শন বেরিয়ে পড়ে। অতি পুরাতন কাব্য, লোকগাথা, গ্রাম-শহরের নাম এবং প্রাচীন কালের ভ্রমণ-বৃত্তান্তও আবিষ্কারের পক্ষে অত্যন্ত দরকারি সংবাদের সূত্র দেয়। এর সঙ্গে আবার আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নত কর্মকৌশলের ব্যবহার তো আছেই।

কোথায় অনুসন্ধান চালাবো

সভ্যতার বিবর্তনের প্রত্যেকটি যুগেই মানুষ প্রাকৃতিক আবহাওয়ার প্রকোপ এবং বন্যজন্তুর ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচতে চেয়েছে। এমন একটা জায়গা সে বরাবরই চেয়ে এসেছে যেখানে সহজে খাদ্য আহরণ করার সুবিধে আছে, সুবিধে আছে প্রতিদিনকার ব্যবহারের উপযোগী হাতিয়ার ও অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণের উপকরণের। আমাদের যদি এই সাধারণ সত্যগুলি জানা থাকে তাহলে আমরা শুধু এমন-সব জায়গাতেই অনুসন্ধান করব যেখানে প্রাচীন কালের মানুষের জীবন ধারণের উপযোগী পরিবেশ ছিল। হাজার হাজার বছর আগেকার প্রস্তরযুগের মানুষের সন্ধান পাবার জন্যে আমরা তখন এদিকে সেদিকে না গিয়ে ছোট-বড় নদীর ধারে, পাহাড়ের গায়ের গুহাগুলিতে অথবা পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে-আসা পাথরের তলায় খোঁজ করতে থাকব। ক্রমে আমরা নদীর ধারের নুড়ি-পাথর থেকে মানুষের তৈরি অতি পুরাতন ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান পাব। পাহাড়ের গুহার মধ্যে অতীত কালের নিশ্চিহ্ন-হয়ে-যাওয়া প্রাণীদের হাড়গোড়ের সন্ধান পাব। তা-ছাড়া মানুষের তৈরি হাড়ে-খোদাই-করা নক্সা ও গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর চিত্রকলা দেখতে পাব। এই সময়কার মানুষ নিজে গৃহ তৈরি করতে পারত না। তাই গুহাতেই

তাদের সন্ধান পাওয়া স্বাভাবিক। পাথরের অস্ত্র তৈরি করবার জন্যে নুড়ি-পাথরে ভরা নদীতীরই তাদের পছন্দ ছিল বেশি। তা ছাড়া উঁচু জায়গাই তাদের প্রয়োজন ছিল, কারণ সেখান থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়, চারিদিকে দৃষ্টি রাখা সম্ভব হয়। কাজেই প্রথম পশুপালকদের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্যে আমাদের এমন সব পাহাড়ের ঢালে সন্ধান চালাতে হবে যে-সব জায়গায় স্বাভাবিকভাবেই নানারকম বুনো ঘাস জন্মায়; নদীমাতৃক সমতল জায়গায়ই খবর নিতে হবে প্রথম চাষীদের জীবনের ইতিহাস জানবার জন্যে। সাগর-তীরের কোন সুরক্ষিত বন্দরে সন্ধান চালাতে হবে প্রথম নগরবাসী মানুষের সঙ্গে পরিচয় লাভ করবার জন্যে।

কিন্তু কোথায়-কোথায় প্রাচীন মানুষের বাস স্বাভাবিক বা প্রত্যাশিত ছিল সেইটুকু শুধু জানলেই সব কাজ শেষ হতে পারে না। সম্ভাব্য স্থানটি নির্বাচনের পরেও প্রত্ন-অনুসন্ধানকারীকে ভূ-প্রকৃতির প্রতি অতি সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। ধরা যাক, দিনরাত বৃষ্টি পড়ছে। দারুণ বর্ষা। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর দেখা গেল, ক্ষেতের আল বা রাস্তার ধারের কাদামাটি ধুয়ে সরে গিয়ে একটা প্রাচীন দালানের একটুখানি কোণ উঁকি মারছে। হয়ত বা মাটির মধ্যে প্রাচীনকালের কোন মুদ্রা বা পাথরের পুঁতি চক্‌চক্‌ করে উঠেছে। সমুদ্র-তরঙ্গের আঘাতে বা নদীর পাড় ভেঙেও অনেক সময়ে প্রাচীন কালের অনেক জিনিস বেরিয়ে পড়ে। ইউরোপের একটি নদী দানিয়ুবের পাড় ভেঙে এইরকমভাবে একটি অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন বেরিয়েছিল। বাংলাদেশের ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি নদীর ধারের কয়েকটি পাড়-ভাঙা জায়গা থেকে প্রাচীন যুগের পাথরের পুঁতি, পোড়া-মাটির পুতুল প্রভৃতি মাঝে-মাঝে পাওয়া যায়। প্রত্ন-অনুসন্ধানের পক্ষে বৃষ্টি-ধোয়া মাঠ-ঘাটের গুরুত্বও বাংলাদেশের নানা স্থান থেকে বুঝতে পারা যায়।

বৃষ্টির মত অনাবৃষ্টি অথবা তুষারপাতের অভাবও প্রাচীন কালের নিদর্শন আবিষ্কারে সহায়তা করে। প্রায় একশো বছরেরও সামান্য আগে জলাভাবের ফলে সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ্ হ্রদের জল অনেকটা নিচে নেমে গিয়েছিল। এর ফলে এক আশ্চর্য আবিষ্কার সম্ভব হয়। হ্রদের ভিতর থেকে প্রায় পুরোপুরি অক্ষত অবস্থায় মধ্য-প্রস্তরযুগের প্রাচীন মানুষের বাসগৃহ বেরিয়ে পড়ে। কাঠের খুঁটির উপর জলের মধ্যে তৈরি করা মাচা ও তার উপরে ঘর-বাড়ির নিদর্শন থেকে আমরা হাজার হাজার বছর পূর্বের জীবনযাত্রার একটা অতি পূর্ণাঙ্গ ছবি পাই। বাতাসে উড়ে যাওয়া বালিয়াড়ির তলা থেকে প্রাচীন দিনের ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ পুনরুদ্ধারের জন্যে ব্রিটেন ও পোল্যাণ্ডের কয়েকটি অঞ্চল বিখ্যাত।

ভূ-প্রকৃতির কয়েকটি বিশিষ্ট রূপ থেকেও প্রাচীন দিনের লুপ্ত সভ্যতার অবস্থিতিটা জানা যায়। একটি প্রান্তরে হয়ত প্রত্নতাত্ত্বিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল যে জলস্রোতের স্বাভাবিক ধারা প্রান্তরটির ঢাল বেয়ে গিয়ে একদিকের মাটিকে ক্ষয় করে ফেলেছে। কিন্তু এক জায়গায় গিয়ে জলপ্রবাহের খাত খানিকটা জায়গাকে উঁচু করে রেখে পাশ দিয়ে আপন প্রবাহের পথ কেটে নিয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে, উঁচু জায়গাটির তলায় অতীতের পাকা ইটের বা পাথরের গাঁথনি থাকার জন্যে জলস্রোতের আঘাতেও ঐ স্থানটির কোন ক্ষতি হয়নি। উষর ও রুক্ষ মাঠের মাঝখানে কোথাও জমির উপরে ঘন গাছপালা ঝোপঝাড় রয়েছে সার বেঁধে। একটু ভাল করে দেখলে বোঝা যাবে, হয়ত ঐ গাছপালার তলায় কোন প্রাচীন দুর্গ-পরিখা, খাত বা পয়ঃপ্রণালী থাকাতে মাটির ঐ অংশটি আশে-পাশের জায়গার থেকে বেশি উর্বর ও জলধারক হয়ে পড়েছে, যেজন্যে ঐখানটিতে গাছের সংখ্যা বেশি এবং

সতেজ। পুরোনো দিনের পরিখা বহুদিন ধরে জমা আবর্জনা এবং বৃষ্টি-ধোয়া জলের সঙ্গে নিয়ে-আসা মাটির সাহায্যে সম্পূর্ণ ভরাট হলেও আগের চেয়ে বেশি উর্বরতা লাভ করেছে।

দিনান্তে পশ্চিম দিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে ধীরে ধীরে। খনন-কার্যের প্রারম্ভে বা সারাদিনের খাটুনির পরে প্রত্নতাত্ত্বিক হতাশ হয়ে ভাবছেন, 'চারিদিকের অন্য সব প্রমাণ বলছে এখানে আরও কিছু প্রাচীন দিনের নিদর্শন থাকা উচিত ছিল। কিন্তু হায়, বহু অনুসন্ধানের পরেও তো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। তবে বোধহয় আর কিছু আবিষ্কৃত হবার আশা নেই।' হঠাৎ প্রত্নতাত্ত্বিকের চোখ পড়ল তেরছা হয়ে মাটি-ছুঁয়ে-যাওয়া সূর্যরশ্মির প্রতি। এমনিতে যে মাঠ মনে হয় সমতল, যে ঢাল মনে হয় একঘেয়ে, সেখানে ছোট-ছোট এবড়ো-থেবড়ো সামান্য উঁচু নিচু জায়গারও ছায়া পড়ে। বৃত্তাকার সমাধি আয়তাকার বাসগৃহের ভিত্তি-সংস্থানের আকৃতিকেও অতি পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলে।

আবার কোথাও হয়ত অনুর্বর জমি অথবা চষা ক্ষেতের মধ্যে দাঁড়িয়ে কিছুই বিশেষ চোখে পড়ছে না। অনুসন্ধানকারী একটি পাহাড়ে চড়লেন অথবা বিমানে করে সম্ভাব্য প্রত্ন-অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়ে গেলেন। অমনি তাঁর চোখে নানারকম অভূতপূর্ব হিসেব ধরা পড়ল। শস্যপূর্ণ মাঠের উপর দিয়ে যাবার সময় শস্যের শ্যামলিমার মধ্যেও একটা গাঢ় অথবা ফিকে রঙের দাগ দেখা গেল। পরে অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে, এ-সব প্রাচীন দিনের ঘরবাড়ি প্রভৃতির চিহ্ন মাত্র। ফরাসী দেশের বৈজ্ঞানিকরা মধ্য-প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসন্ধান চালিয়ে উড়োজাহাজ থেকে মাটির উপরকার প্রাচীন দিনের নগর-সংস্থান, পথ-ঘাট প্রভৃতির সন্ধান পেয়েছেন। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বহু প্রাচীন স্থানও এইভাবে চিনতে পারা গেছে। বর্তমানে উড়োজাহাজ থেকে গ্রহণ-করা আলোকচিত্রও প্রত্ন-অঞ্চল আবিষ্কারের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কামানের গোলা ও বোমার আঘাতে সৃষ্ট গর্ত ও যুদ্ধক্ষেত্রের পরিখার মধ্য থেকে প্রাচীন কালের বহু সভ্যতার সংবাদ এসেছে। পূর্ব-জার্মানির কোন-কোন অংশ, ইটালি এবং ফ্রান্সের প্রস্তর-যুগের সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। বিমান ক্ষেত্র তৈরি এবং বিস্তৃত এলাকার বিমান থেকে নেওয়া আলোকচিত্র গ্রহণ করতে গিয়েও যুদ্ধের প্রচেষ্টা প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানকে প্রেরণা দিয়েছে।

তোমাদের মত উৎসাহী ও সাহসী কিশোরদের দ্বারাও অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ন-আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। ফরাসী দেশের একটি গ্রামে তিনটি স্কুলের ছেলে তাদের প্রিয় কুকুরটিকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল একটি পাহাড়ের চূড়ার কাছে। সেখানে একটি গাছ-



প্রস্তর-যুগের গুহাচিত্রে ঘোড়া ও বাইসন—ফরাসী দেশ

উপড়ে-সৃষ্টি-হওয়া গর্তে তাদের কুকুরটি হারিয়ে যায়। কুকুরটিকে খুঁজে বার করবার জন্যে ছেলে-কটি দড়ি আর মোমবাতি নিয়ে ঐ গর্তের মধ্যে ঢুকে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগেকার প্রাচীন প্রস্তরযুগীয় মানুষের আঁকা মনোমুগ্ধকর বাইসন, ঘোড়া, ম্যামথ ও বল্গা হরিণের ছবি দেখতে পায়। পরে বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক আঁরি ব্রুল লাস্কাউ গুহার এই অপূর্ব চিত্রের কথা জগৎবাসীকে জানিয়ে দেন।

আধুনিক নাম থেকে প্রাচীন কালের নাম

মানুষ যখন একটা জায়গার নাম দেয় তখন সে নামটি বহুদিন বাদে নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে এমন একটা অবস্থায় এসে

পড়ে যখন তাকে আর যেন চিনতে পারা যায় না। কিন্তু এই নামগুলিকে একটু সাবধানতার সঙ্গে বিচার করলেই পুরোনো দিনের আসল নামটি উদ্ধার করা যেতে পারে। বিভিন্ন দিনের প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে এরকমের বহু স্থানীয় নামের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতে তো এ-রকম নিদর্শনের একেবারে ছড়াছড়ি। কোন-কোন ক্ষেত্রে অবশ্য স্থানীয় নাম প্রায় অবিকৃতই থেকে যায়। ইটালির রোম, গ্রীসের এথেন্স, ভারতের রাজগীর প্রভৃতি জনপদের নাম এই ধরনের। বিকৃত নামও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে খুব কার্যকরী। উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ জেলার যমুনা-তীরবর্তী গণ্ডগ্রাম কোসাম এবং গোরখপুর জেলার ক্ষুদ্র গ্রাম কসিয়া প্রত্ন-অনুসন্ধানের ফলে যথাক্রমে প্রাচীন কালের বিখ্যাত মহানগরী কৌশাম্বী ও বুদ্ধের মহানির্বাণের জন্যে বিখ্যাত কুশীনগর বলে প্রমাণিত হয়েছে। গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের বিবরণে পাটলিপুত্রের নাম পালিবোথ্রা বলে উল্লিখিত। বর্তমানের পাটনাকে প্রাচীন পাটলিপুত্রের সঙ্গে যুক্ত করতে অসুবিধে হয় না। এমনিভাবেই বিহারে পাটনা জেলার গিরিব্রজ অথবা রাজগৃহকে বর্তমানের রাজগীর অথবা মেদিনীপুরের তমলুককে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বলে চিনতে পারা যায়। তবে নামের সাহায্যে প্রাচীন স্থানকে চিনতে গিয়ে খুব সাবধানে অগ্রসর হবে হবে। বিভিন্ন ভাষায় উচ্চারণের প্রকৃতি ও তার তুলনামূলক আলোচনা না করে অথবা শব্দ-বিবর্তনের সাধারণ নিয়মাবলী না জেনে কেবলমাত্র স্থানীয় নামের মোটামুটি একটা সাদৃশ্যের দ্বারা কোন স্থানের প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করতে গেলে ভুল হবার সম্ভাবনাই থেকে যায়। নামের প্রমাণের সঙ্গে অন্যান্য যুক্তিগ্রাহ্য লক্ষণ মিলে গেলে তবেই এ-সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

আর-এক ধরনের নামও প্রাচীন কালের ধ্বংসস্তূপকে চিনিয়ে দেয়। এই নামগুলির সঙ্গে হয়ত আসল নামটির কোন যোগ নেই। তবে এই ধরনের নাম থেকে প্রত্ন-অঞ্চলের বিশিষ্টতা যে সাধারণ

মানুষকে আকৃষ্ট করেছে যুগ যুগ ধরে, তা সহজেই বোঝা যায়। রুশ-দেশের একটি গ্রামের নামের অর্থ, 'হাড়ের গ্রাম'। পরে এই গ্রামে অনুসন্ধান চালিয়ে হাজার হাজার বছর আগেকার লুপ্ত ম্যামথের হাড় প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে। 'মহেন-জো-দাড়ো' নামের অর্থ, 'মরা মানুষের ঢিবি।' এ-থেকে কি মনে হয় না যে, সিন্ধু-সভ্যতার এই মৃত শহরের অবস্থানের অঞ্চলটি লোক-মানসে এক বিশিষ্ট স্থান রূপে চিহ্নিত হয়েছিল? আমাদের দেশে গোল ধরনের উঁচু জায়গাকে 'ঢিবি', উপরের দিকের অপেক্ষাকৃত সমতল জায়গাকে 'ডাঙা', ঘরবাড়ির ইট-বেরিয়ে-থাকা মাটি-চাপা-পড়া ধ্বংসাবশেষকে 'ভিটা', উঁচু জায়গা ও সারি-বাঁধা প্রাচীরের মত ভূ-প্রকৃতিকে 'গড়' প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। অনুসন্ধানের ফলে এ-সব জায়গার মাটির তলা থেকে স্তূপ, মন্দির, দুর্গপ্রাকার এবং নগরের ধ্বংসাবশেষ বেরিয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা বর্ধমানের পাণ্ডুরাজার ঢিবি, চব্বিশ পরগণা জেলার খনা-মিহিরের ঢিবি ও চন্দ্রকেতুগড়, মুর্শিদাবাদের রাজবাড়িডাঙা প্রভৃতির কথা স্মরণ করতে পারি। পশ্চিম বাংলার এইসকল স্থানে গত কয়েক বছর ধরে খননকার্য চালিয়ে বাংলাদেশের অতি প্রাচীন কালের কৃষক-সমাজের জীবনযাত্রার কথা জানতে পারা গেছে। মৌর্য, শুঙ্গ ও গুপ্ত রাজবংশের এবং তার পরবর্তীকালের ছোটখাট প্রত্ন-নিদর্শন ও বড়-বড় মন্দির, বৌদ্ধ বিহার ও প্রাচীরবেষ্টিত জনপদের বিভিন্ন অংশ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান কালের অনেক শহরই অতি প্রাচীন কালের কোন শহরের ধ্বংসস্তূপের উপর অবস্থিত। যাতায়াতের সুবিধে, সুরক্ষিত নদী-পথের নৈকট্য প্রভৃতি কারণেই এই রকমটি হয়েছে। বর্তমান কালের এই সমস্ত শহরে ঘর বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে পরিখা কাটানোর সময় প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন বেরিয়ে পড়া মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। বিহারের রাজধানী পাটনা শহরের পয়ঃপ্রণালী তৈরি করার

সময়ে প্রাচীন কালের বহু প্রত্ন-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের লণ্ডন শহরেও বাড়ির ভিত খুঁড়তে যাওয়ার ফলে রোম্যান আমলের মোজাইক-করা মেঝের সন্ধান পাওয়া গেছে।

গল্প, উপকথা থেকেও প্রাচীন কালের বহু তথ্য পাওয়া যায়

প্রাচীন কালের মহাকাব্যের বর্ণনা, পরিব্রাজকদের বিবরণ, উপকথা প্রভৃতিও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের নানান দিককে আলোকিত করে তোলে। এ সম্পর্কে জার্মান আবিষ্কারক হাইন্‌রিত্‌ শ্লীম্যানের ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়ার ঘটনাটি খুব উল্লেখযোগ্য।

১৮২৯ সালে সাত বছরের ছোট্ট ছেলে শ্লীম্যানকে তার বাবা একটি চিত্রিত ইতিহাসের বই উপহার দিয়েছিলেন। বইটিতে গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ট্রয় নগরীর আগুনে দগ্ধ হওয়ার একটি ছবি ছিল। ছবিটির সৌন্দর্য বালককে একেবারে অভিভূত করে তোলে। জীবনের নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও শ্লীম্যান গ্রীক মহাকবি হোমারের ইলিয়াড মহাকাব্যটির কথা ভুলতে পারেন নি। গ্রীক ও অন্যান্য বহু ভাষা শ্লীম্যান অত্যন্ত ধৈর্য নিয়ে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেন। তারপর তিনি ট্রয় নগরী আবিষ্কার করার জন্যে তুরস্ক দেশে যান। তখনকার দিনের পণ্ডিতেরা সাধারণত যে স্থানটিকে ট্রয়ের ধ্বংসাবশেষ রূপে নির্দেশ করতেন শ্লীম্যান হোমারের ট্রয় বর্ণনার সঙ্গে তার অমিল লক্ষ্য করেন। হোমারের বর্ণনাকে যুক্তিসম্মতভাবে কাজে লাগিয়ে তুরস্কের হিসারলিক্‌ নামে একটি গ্রামের নিকটবর্তী ঢিবিকে ট্রয় নগরীর অবস্থান বলে নির্দেশ করা হয়। সেখানে তিনি খননের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ক্রমে ট্রয় নগরীর বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শন সমস্ত পৃথিবীর পণ্ডিত-সমাজকে স্তম্ভিত করে দেয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রেও এ-ধরনের নজিরের অভাব নেই। প্রাচীন গ্রীক ও চীন-দেশীয় পরিব্রাজকদের ভারত

পর্যটনের বিবরণ প্রাচীন ভারতের বহু জনপদকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করেছে। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণে বিভিন্ন স্থানের মোটামুটি দূরত্বের উল্লেখ থাকায় আবিষ্কারের কাজে বেশ সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। ভারতের পুরাণ কথায়, মহাকাব্যের বর্ণনায় এবং বিদেশী নাবিকদের বিবরণেও প্রত্নতত্ত্বের অনেক সুবিধে হয়েছে। ভারতের উপকূলের বহু বন্দর ভূমধ্যসাগরীয় নাবিকদের বিবরণের মাধ্যমে আমরা চিনতে পারি।

নাবিকদের কথায় জলের তলায় প্রাচীন দিনের আবিষ্কারের কথা মনে পড়ল। সাম্প্রতিক কালে ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগে প্রাচীন বন্দর প্রভৃতিতে ডুবুরি নামিয়ে গ্রীক ও রোম্যান আমলের বহু অতীত নিদর্শন পাওয়া গেছে। পুরোনো দিনের ডোবা জাহাজের জিনিসপত্র এ-রকমভাবে উদ্ধার করার কাজ আরও অগ্রসর হলে হয়ত ঐ অঞ্চলের প্রাচীন বাণিজ্যের প্রকৃতি আরও ভালভাবে বুঝতে পারা যাবে।

এ-পর্যন্ত আমরা প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রগুলি কিভাবে চেনা যাবে সেই কথাই বললাম। এবারে চিনে-নেওয়া প্রত্নস্থলে মাটি না খুঁড়ে প্রাচীন ঘরবাড়ি, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি নির্দেশক কয়েকটি আধুনিক পদ্ধতির কথা বলব।

তোমরা এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, ফাঁপা জিনিস ও ভরাট জিনিসের উপর আঘাত করলে যে শব্দ হয় তার প্রকৃতি আলাদা। একটা খালি সুটকেস বা তোরঙ্গ অথবা ভর্তি সুটকেস বা তোরঙ্গ রাখবার বা নড়ানোর সময়ে ঠোকাঠুকির ফলে যে আওয়াজ হয় তা থেকে সুটকেস বা তোরঙ্গটা খালি, না ভর্তি তা সহজেই বুঝতে পারি। অনেকটা এমনি ধরনে মাটির উপরে আঘাত করে করে যে প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় তার সাহায্যে নিচের ঘর বা সমাধি-কক্ষের সঠিক অবস্থান বুঝতে পারা যায়। সাধারণ একটা বড় গাঁইতির মাথা দিয়ে ঠুকে ঠুকে এ কাজটি করা যেতে পারে। একটা ছোট টিনের কৌটো

গলানো সিসে দিয়ে ভর্তি করে নিয়ে তার মাঝখানে একটা পাইপ ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারপর সেই পাইপের মধ্যে একটা বড় লাঠি আটকে দিয়ে ঠুকে ঠুকে বেশ ভাল প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

বিদ্যুৎ পরিবহণ-ক্ষমতার তারতম্য বিচার করেও অনেক খবর পাওয়া যায়। সাধারণত জোলো মাটি বা জল ও লবণ-জাতীয় পদার্থ-মেশানো মাটি সহজেই বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিবহণ করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে শুকনো ইট-পাথরের পাকা দালান বিদ্যুৎ-প্রবাহকে প্রতিরোধ করে। প্রত্নস্থলের মাটির উপর কয়েকটি লোহার শলাকা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তার ভিতরে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালিয়ে নির্দেশক যন্ত্রের কাঁটার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রত্ন-অনুসন্ধানীরা মাটির কোন্ অংশে প্রতিরোধের ক্ষমতা বেশি আর কোথায় কম এ-সব বিচার করেন। এ থেকে মাটির তলাকার পরিখা, ঘরবাড়ি প্রভৃতির সঠিক অবস্থান অনুমান করতে পারেন তাঁরা।

কোন স্থানের চৌম্বকত্ব নির্ধারণ করেও মাটির তলাকার লোহার জিনিস, পুড়ে-যাওয়া মাটিওলা ঘরবাড়ি, কুমোরের ভাঁটি প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। তবে, এই পদ্ধতি তখনই কাজে লাগবে যখন প্রত্নতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গি হবে তীক্ষ্ণ আর তাঁর প্রকৃতি হবে অসীম ধৈর্যশীল ও অনুসন্ধানী। হেলাফেলা করে সহজে কার্যোদ্ধার করবার ইচ্ছা থাকলে প্রাচীন জিনিসের আবিষ্কার কোনক্রমেই সম্ভব হবে না।

S.C.E.R.T., West Bengal Library Calcutta 25/3, B. C. Road
STATE INSTITUTE OF EDUCATION BANIPUR

৩

কাল-নির্ণয়ের কথা

প্রাচীনকালের যে-সব নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলিকে আমরা সাধারণত দেশ ও কাল হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি। নিদর্শনগুলি কোন্ দেশের আমরা সহজেই জানতে পারি, কিন্তু জিনিসটি কতকালের পুরোনো—এই কথাটি জানা তেমন সহজ নয়। এ জানবার জন্যে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নানারকম যুক্তিসম্মত পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

প্রাচীন যুগের কাল-নির্ণয় কী করে করা হয়

ধরা যাক, কোন এক জায়গায় বহু পুরোনো দিনের এমন একটা সভ্যতার কথা জানতে পারা গেল যার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক-ভাবে কোন ধারণাই করা যাচ্ছে না। এ-ক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্বের কর্মীরা কী করবেন? প্রথমেই তাঁরা চেষ্টা করবেন ঐ স্থানে আবিষ্কৃত দ্রব্যগুলিকে সাজিয়ে নিয়ে এমন একটা শ্রেণী-বিভাগের সৃষ্টি করতে যা থেকে কোন্ জিনিসগুলো আগে তৈরি আর কোন্গুলো খানিকটা পরে তৈরি সেটা সহজেই বোঝা যায়। এ কাজটি করার কয়েকটি কৌশল আছে। মানুষ যে-সব জিনিস ব্যবহার করে তা প্রথমটা অপেক্ষাকৃত সরল ধরনের হয়। তারপর ধীরে ধীরে জিনিসগুলির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে। ফলে আস্তে আস্তে মানুষ তার কাজের পক্ষে আরও উপযুক্ত ও আরও সুন্দর জিনিস তৈরি করতে সমর্থ হয়। কাজেই সরল ধরনের জিনিসগুলিকে আগের ও বিবর্তিত জিনিসগুলিকে পরের বলে ধরে নেওয়া যায়। এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, কোন একটি সভ্যতা তার বিকাশের শীর্ষে উঠে যে-সব সুন্দর কারুকার্য-সমন্বিত জিনিসপত্র বা ঘরবাড়ি তৈরি করেছিল, পতনের যুগে সেগুলি ক্রমশ

অসুন্দর ও অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং অন্ধভাবে অনুকরণ করা হয়ে থাকে। প্রাচীন কালে ব্যবহৃত পাথর, তামা ও লোহার অস্ত্রশস্ত্র ও কুঠারের বিবর্তন এবং সেকালে তৈরি টাকা-পয়সা অলঙ্কার প্রভৃতির ব্যাপক অনুকরণ ও ক্রমাবনতির দিকে লক্ষ্য করলে কথাটা সহজেই বুঝতে পারা যাবে। তৈজসপত্র ও ঘরবাড়ির বিবর্তন ও ক্রমাবনতি ছাড়াও বিভিন্ন সময়ের অবশিষ্ট ধ্বংসাবশেষের স্তরগুলির ক্রমবিন্যাসও আগে-পরের প্রশ্নটিকে সহজ করে দেয়।

কিন্তু শুধুমাত্র আলাদাভাবে কোন একটি স্থানের সভ্যতার বিবর্তন জানলেই প্রত্নতাত্ত্বিকের কাজ শেষ হয় না। সমস্ত জগতের সভ্যতা ও সাধারণ ইতিহাসের সঙ্গে একটা সম্পর্ক বার করে দেখাতে না পারলে কাজ চলে না। প্রাচীন কালের সভ্যতার সময় বা কাল নির্ধারণ করতে তখন অন্য একটি পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়ে থাকে। প্রাচীন কালের এমন অনেক জিনিস আছে যা ব্যবসায়িক বা অন্যান্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে বহু দূর দূর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোন একটি সভ্যতায় ব্যবহৃত জিনিসের প্রকৃতি যদি জানা থাকে তাহলে তার সাহায্যে অন্য একটি অজানা সভ্যতার প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করার কাজটি সহজ হয়ে পড়ে। প্রাচীন সিন্ধুদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নগর-সভ্যতার বিশেষ ধরনের 'সীল' বা মুদ্রা মেসোপটেমিয়া বা বর্তমান ইরাক অঞ্চলের অতি প্রাচীন রাজা সারগনের সময়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। এর ফলে প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে কাল নিরূপণ করার কাজটা অনেক সহজ হয়েছে। সারগনের রাজত্বকাল খ্রীস্টপূর্ব দু-হাজার চারশো বছরের মাঝামাঝি সময়ের। এর ফলে প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার সময় নির্ধারণ করা গেছে। এও বোঝা গেছে যে, ঐ সময়ে সিন্ধু-সভ্যতা ব্যবসা, বাণিজ্য ও সমৃদ্ধিতে অদ্বিতীয় ছিল। একই ভাবে প্রাচীন মিশর, ক্রীট এবং গ্রীস দেশের সঠিকভাবে জানা প্রত্ননিদর্শনের সাহায্যে ইউরোপের বহু অনগ্রসর সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারনা পরিষ্কার হয়েছে।

ভূতত্ত্বও এ কাজে সাহায্য করে

হাজার হাজার বছর আগেকার মানুষের জীবনযাত্রার সঠিক খবরটি বের করার জন্যে অনেক সময় ভূ-প্রকৃতির সাহায্যও গ্রহণ করা হয়। তোমরা 'পৃথিবীর কথা'য় পড়েছ যে, বহু হাজার বছর আগে বার-বার ভীষণ তুষার-আক্রমণ নানা প্রাকৃতিক তাণ্ডবের চিহ্ন রেখে গেছে পৃথিবীর বুকে। এই অতি প্রাচীন হিমবাহ প্রভৃতির দ্বারা নিয়ে-আসা পাথর, মাটি প্রভৃতি স্তরে স্তরে পৃথিবীর বুকে জমা পড়েছে। মানুষের কঙ্কাল, তার ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, মানুষের শিকার-করা জীবজন্তুর হাড় প্রভৃতি যদি এইরকম একটা জানা স্তর থেকে পাওয়া যায় তবে সেগুলি কতকালের পুরোনো তা বোঝার পক্ষে কোনও অসুবিধে হয় না। হিমবাহের আগমন ও পিছিয়ে যাওয়ার যুগের কথা ছাড়াও পৃথিবীর কোন-কোন স্থানের বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, অনাবৃষ্টি ও শুষ্কতার যুগের কথাও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রাচীনত্ব বুঝিয়ে দিতে সাহায্য করে। সমুদ্রজলের হ্রাস-বৃদ্ধির সাহায্য নিয়ে সমুদ্রতটের পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত প্রাচীন কথা জানা যায়।

আধুনিক বিজ্ঞানও নানাভাবে কাজে লাগানো হয়

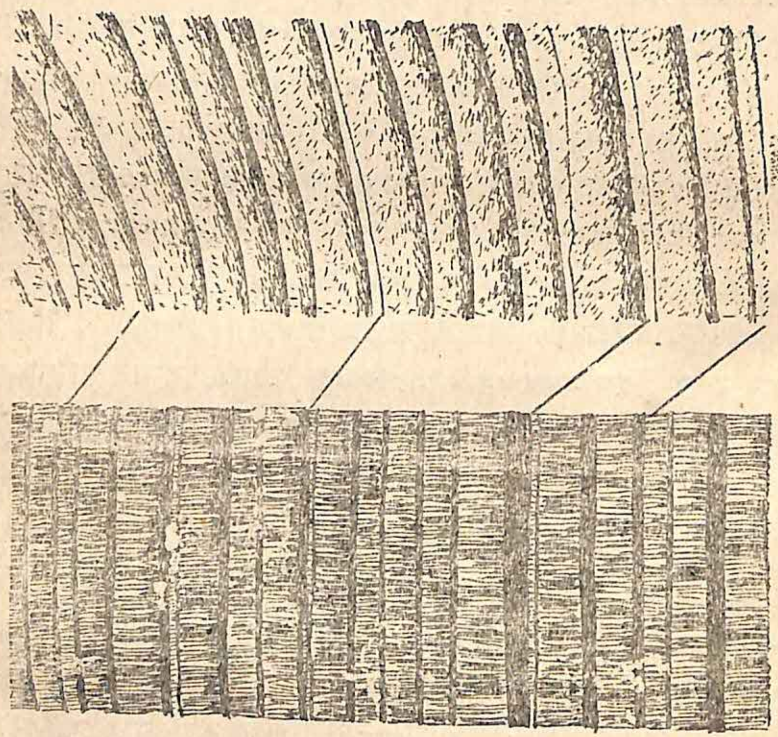
'কত পুরাতন', এই কথাটি জানবার জন্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নানা দিক দিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিককে সাহায্য করে থাকে। এই বিষয়টি নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতেরা এখনও বহু গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা এখানে এর মধ্যে কয়েকটির সম্পর্কে একটু আলোচনা করব।

প্রাচীনত্ব নির্ধারণের পদ্ধতিগুলির মধ্যে রেডিও-কার্বন পদ্ধতিটি এখন খুবই পরিচিত হয়েছে। আমরা জানি, মহাজাগতিক রশ্মি বা কস্‌মিক রে-র প্রভাবে মহাকাশে অনবরত নিউট্রন কণিকার সৃষ্টি হচ্ছে। মহাকাশের নাইট্রোজেন পরমাণুকে আঘাত করে এই নিউট্রন কণিকা ; ফলে তৈরি হয় হাইড্রোজেন ও সামান্য পরিমাণে কার্বন-১৪।

কার্বন-১৪ হল সাধারণ কার্বনের একটি আইসোটোপ। এ আইসোটোপটি তেজস্ক্রিয়, অর্থাৎ এ থেকে অনবরত অ্যাল্‌ফা, বিটা এবং গামা-রশ্মি বেরোয়। অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই কার্বন-১৪ কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হচ্ছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড পৃথিবীর গাছপালার দ্বারা শোষিত হয়। শেষকালে নানা প্রাণী এই গাছপালা খেয়ে তাদের দেহে কার্বন-১৪ জমা করে রাখে। প্রাণীদেহের কার্বন-১৪ অংশ প্রাণীর মৃত্যুর পর আবার নাইট্রোজেনে বদলে যায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, জীবন্ত প্রাণীদেহে কার্বন-১৪-এর পরিমাণ সবসময়েই এক থাকে। আবার মৃত্যুর পর সকল প্রাণীই একই গতিতে কার্বন-১৪ হারায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, সাড়ে পাঁচ হাজার বছরে কার্বন-১৪-এর অর্ধেক, এবং এগারো হাজার বছরের কাছাকাছি সময়ে তিন চতুর্থাংশই বিনষ্ট হয়। সতেরো হাজার বছর পর কার্বন-১৪ কমে গিয়ে প্রাণীদেহে এর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রথমে যা ছিল তার আট ভাগের এক ভাগ। সত্তোর হাজার বা তারও বেশি পুরোনো জিনিসে কার্বন-১৪ প্রায় পুরোপুরিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়। সুতরাং কার্বন-১৪-এর পরিমাণ বের করে প্রাচীন শস্যবীজ ও দানা, কাঠ, মানুষ ও জন্তুজানোয়ারের হাড় প্রভৃতির বয়স বোঝা যায়। বর্তমানে ভারত-সমেত পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই এই পদ্ধতির সুফল ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতিতে আবিষ্কৃত বয়সের সঙ্গে অন্যভাবে নিরূপিত বয়সের তাৎপর্যপূর্ণ মিল লক্ষ্য করা গেছে। আশা করা যায় যে, সময়-বিচারের ক্ষেত্রে কার্বন-১৪ পদ্ধতি আরও উন্নত ও সঠিক সন্ধান দেবে। এ উপায়ে সময় নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, সিন্ধু-সভ্যতার সময় হল যীশুখ্রীস্টের জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার।

তোমরা কাটা গাছের গুঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে নিশ্চয়ই দেখবে যে, এর মধ্যে অনেকগুলি বৃত্তের চিহ্ন রয়েছে। উদ্ভিদ-

তত্ত্ববিদগণ নানা গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এগুলি বিভিন্ন বছরে গাছের বয়স ও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আয়তন-বৃদ্ধির ছাপ মাত্র। আমরা যদি এ সব বৃত্তচিহ্নের সাহায্য নিই তাহলে প্রাচীন কাঠের খুঁটি, কড়িকাঠ প্রভৃতির বয়স সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি। তবে, এই সম্পর্কে কাজ করতে গেলে



বৃক্ষের গায়ের দাগ থেকে তার বয়স ও প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের তুলনামূলক পদ্ধতি

অতি সাবধানে অগ্রসর হতে হবে। গাছের গুড়ির এই দাগগুলির মাপ বা আয়তন সব সময় এক রকম হয় না। সূর্যালোকের তারতম্য একে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, আদ্র´তা বা শুষ্কতাও এর উপরে কাজ করে। উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া, অ্যারিজোনা, নিউ মেক্সিকো প্রভৃতি অঞ্চলে এই পদ্ধতি সর্বপ্রথম

কাজে লাগানো হয়েছিল। বর্তমানের পাইন গাছগুলির সঙ্গে পারস্পরিক তুলনামূলক বিচার করে ক্রমশ আমেরিকার প্রাচীন রেড্‌ ইণ্ডিয়ান উপজাতিদের প্রায় হাজার বছর আগেকার তৈরি ঘরবাড়ির বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের কোন-কোন অঞ্চলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া গেছে। অবশ্য সকল ধরনের বৃত্তাকার ছাপই কাল নিরূপণের পক্ষে সুবিধেজনক হয় না। যে সমস্ত ক্ষেত্রে বৃত্তাকার ছাপ বা দাগের আয়তন স্পষ্টত আলাদা আলাদা ভাবে সরু অথবা মোটা হয়েছে সেইগুলিই কাল নিরূপণের উপযোগী। তবে এই পদ্ধতির ব্যবহার কয়েকটি মাত্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। ক্রমে-ক্রমে এই পদ্ধতির আরও ব্যাপক ব্যবহার হলে আমরা প্রাচীন দিনের আবহাওয়া, সময় এবং মানব-সংস্কৃতি সম্পর্কে আরও খবরাখবর সংগ্রহ করতে পারব।

উদ্ভিদের সাহায্যে আমরা প্রাচীন দিনের আরও অনেক খবর জানতে পারি। প্রাচীন কালের নানা ধরনের উদ্ভিদের পুংকোষ-সমন্বিত ফুল-রেণু গাছ থেকে ঝরে পড়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এই ফুল-রেণুগুলিও প্রাচীনত্ব বোঝবার পক্ষে আমাদের সাহায্য করতে পারে। চুনাপাথরশূন্য অঞ্চলে অনুকূল মাটিতে এই ফুল-রেণুর অবস্থান প্রায় অবিকৃতভাবেই লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সময়ের বরফের সঙ্গে বাহিত মাটির স্তরের সঙ্গে একটা তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের সাহায্যে আমরা প্রাচীন দিনের উদ্ভিদ জগত, আবহাওয়া ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করতে পারি। রেডিও-কার্বনের সাহায্যে সময়-নিরূপণ পদ্ধতির সঙ্গে-সঙ্গে এই কৌশলের ব্যবহার হলে প্রাচীন দিনের একটি সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে।

প্রাচীন কালের অস্থি ও হাড়গোড়-জাতীয় জিনিসের প্রাচীনত্ব জানবার জন্যে আর-একটি আধুনিক উপায়ের সাহায্য নেওয়া হয়। এর নাম 'ফ্লোরিন সময় নিরূপণ পদ্ধতি'। মাটিতে-চাপা-থাকা হাড় প্রভৃতিতে ধীরে ধীরে ফ্লোরিন নামক মৌলিক পদার্থের

অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। হাড়ের মধ্যে ফ্লোরিনের পরিমাণ মেপে কোন একটি জায়গা থেকে পাওয়া বিভিন্ন হাড়ের টুকরো একই সময়ের কি না, অথবা কত প্রাচীন, সেটা জানা সম্ভব হয়েছে। ফ্লোরিন পদ্ধতির সাহায্যেই ইংল্যাণ্ডের সাসেক্স অঞ্চলের পিল্‌ট্‌ ডাউন থেকে পাওয়া মানুষের মাথার খুলির যথার্থ ও সঠিক প্রকৃতি জানা গেছে। এমনিভাবে অপেক্ষাকৃত অধিক ফ্লোরিনের উপস্থিতি প্রাচীনতার এবং কম ফ্লোরিনের উপস্থিতি অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ইঙ্গিত দেয়।

বর্তমান বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রত্নতত্ত্বের সময়ের বিচারে আরও অনেকভাবে সাহায্য করছে। এই ধরনের আর-একটি পদ্ধতি 'প্রত্ন-চৌম্বকত্ব' পদ্ধতি নামে পরিচিত। পৃথিবীর বহু ধরনের পাথর ও কাদামাটির মধ্যে অল্পবিস্তর লোহার অক্সাইড বর্তমান। এর মধ্যে অল্প পরিমাণে চৌম্বকত্ব গুণ থাকে। প্রাচীন কালের উনুন, কুমোরের ভাঁটি এবং পোড়া মাটির ঘরবাড়ির মধ্যে চৌম্বকত্বের পরিমাণ প্রায় অবিকৃত অবস্থায় থাকে। এই চৌম্বকত্বের পরিমাণ ও প্রকৃতি মেপে তার সঙ্গে পৃথিবীর বর্তমান চৌম্বক-ক্ষেত্রের তুলনা করে এ-সব জিনিসের বয়স বের করা যেতে পারে। বর্তমানে এই পদ্ধতিটি খুব নিখুঁতভাবে ব্যবহার করে ভাঙা মৃৎপাত্রের অংশগুলি কোন একটি বিশেষ পাত্রের কি না সেটা বোঝার উপায় সহজ হয়েছে।



চৌম্বকত্বের সাহায্যে প্রাচীন খোলামকুচির বয়স ও স্থান নির্ণয়

বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বয়স নিরূপণের আরও নানারকম পদ্ধতির উৎপত্তি হয়েছে উত্তাপ ও আলোক-বিকিরণের

সাহায্যে প্রাচীন মৃৎপাত্র অথবা লাভা পাথরকে উত্তপ্ত করে। এই পদ্ধতির সাহায্যে, একটি মৃৎপাত্র কত আগে আগুনে পোড়ানো হয়েছিল অথবা কখন এটিকে রন্ধনের জন্যে আগুনে ব্যবহার করা হয়েছিল তা জানতে পারা যায়। প্রাচীন কালের সংস্কৃতির নিদর্শনের মধ্যে মৃৎপাত্রই সর্বপ্রধান যে-সব ক্ষেত্রে, সে-সব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বয়স নিরূপণে এই পদ্ধতিটি অপরিহার্য। এ ছাড়াও পটাসিয়াম-আরগন পদ্ধতি, অব্‌সিডিয়ান এবং ব্যাসাল্ট পাথরের বয়স নির্ধারণ পদ্ধতি প্রভৃতির সাহায্যে আগেকার কালের অতি প্রাচীন মানুষ ও ভূ-প্রকৃতির কথা জানতে পারা যাচ্ছে। এ-সব পদ্ধতিতে অতি-আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যবহার লক্ষ্য করার মত।

যেখানে সময় নিরূপণের অন্য কোন চিহ্ন নেই সেখানে কী করে সময় নির্ধারণ করা হয়, যেখানে জানা নিদর্শনের সাহায্যে অজানা সভ্যতার কাল নির্ণয় করা হয় আর যেখানে নানারকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য এ কাজে লাগানো হয়, সে সব কথা এখানে সংক্ষেপে বলা হল। তবে, প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে এটাই সব নয়। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের তারিখ, সন প্রভৃতির ব্যবহারও নানারকমের সমস্যার উদ্ভব ঘটায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগের সময়-নির্ধারণ পদ্ধতিতে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। প্রাচীন কালের ইতিহাসের পুনর্গঠন করতে গেলে প্রত্যেক প্রত্নতাত্ত্বিককে এ বিষয়ে অবহিত হতে হবে। মিশর ও মেসোপটেমিয়ার সব-চাইতে পুরোনো দিনপঞ্জীর আবির্ভাবের সময় থেকে আজ পর্যন্ত নানান ধরনের দিনপঞ্জী ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বর্তমানে খ্রীস্টের মৃত্যুর সময় হতে গণনা-করা খ্রীস্টীয় শতাব্দী সর্বাধিক প্রচলিত। আমাদের ভারতবর্ষেও বিক্রমাব্দ, শকাব্দ, গুপ্তাব্দ প্রভৃতি নানা ধরনের কাল-গণনার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আমেরিকার কোন-কোন প্রাচীন জাতি-গোষ্ঠী এবং এশিয়ার তুর্কি, মঙ্গোল ও তিব্বতীয় প্রভৃতি জাতিরা সময়কে কয়েকটি বার-বার-ঘুরে-আসা কল্পে বা

যুগে ভাগ করে নিতেন। তারপর এই যুগের অন্তর্গত বছরগুলিকে নানা প্রাণী প্রভৃতির নামে আলাদা-আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হত। সূর্য বা চন্দ্রের গতিপথের প্রকৃতির সাহায্যে সময় নিরূপণের কাজও করা যেতে পারে। কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার সময়ে আকাশের নক্ষত্র-সংস্থান কিরূপ ছিল এবং বর্তমানে তা থেকে কতটা পরিবর্তন হয়েছে এ-সব বিচার করেও সঠিক সময়ের হিসেব পাওয়া যায়।

কাল বা সময় বিচারের সাহায্যেই আমরা অতীতের নানা সভ্যতার সত্যিকারের অবদান, উত্থান-পতন, বিভিন্ন ধরনের সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাবের কথা জানতে পারি।

৪

মৃৎপাত্রের কথা

ভাঙা মাটির পাত্র অবহেলার নয়

মাটির বাসনের আর কীইবা দাম? সহজেই তোমাদের মনে এ কথাটা উঁকি দিতে পারে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই মাটির বাসন-কোসনের কথা প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে এত কাজে লাগে কেন সেটা বোঝা যাবে। মাটির জিনিস কম দামি। সেইজন্যেই মানুষ ঘরকন্নার কাজে মাটির তৈরি জিনিসই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে এসেছে। ভাঙা মাটির পাত্রকে মানুষ অবহেলা-ভরে ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন পাত্র জোগাড় করেছে। সর্ব দেশে সর্ব কালে মানুষের জীবন-যাত্রায় মাটির এই ব্যাপক ব্যবহারই প্রত্নতত্ত্বের কর্মীদের কাছে মৃৎপাত্রকে এত মূল্যবান করে তুলেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে কম চমকপ্রদ ও অখ্যাত ধ্বংসস্তূপ থেকেও আর কিছু না পাই তো মৃৎপাত্র পাওয়ার আশা করতে পারি আমরা। ভিন্ন-ভিন্ন যুগের মানুষ বিভিন্ন গড়নের, বিভিন্ন রঙের, হাল্কা, ভারি নানা জাতের মাটির জিনিস ব্যবহার করেছে। তাহলেই বুঝতে পারছ, ঠিকমত চিনতে পারলে কেবলমাত্র মাটির তৈরি তৈজস-পত্রের সাহায্যেই আমরা প্রাচীন কালের নানান সভ্যতাকে সহজে চিনতে পারি। মাটির পাত্রের গড়ন, গায়ের রঙ ও নানারকমের নক্সার কাজ, এর কোনটাই আকস্মিকভাবে হয় না। পাত্রের স্থূলতা, মসৃণতা এবং কর্কশতা, সবকিছু কোন বিশেষ সমাজের অগ্রগতির পরিচয় বহন করে।

মাটির পাত্র তৈরি করার জন্যে কাদামাটি দরকার। জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ক্রিয়ার ফলে পাথরেও পচন ধরে। পচে-যাওয়া পাথর বরফের স্রোত বা জলস্রোত দ্বারা সারা পৃথিবীর

অধিকাংশ জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সরাসরি পাথর থেকে তৈরি-হওয়া এই কাদামাটি 'প্রাথমিক কাদা' নামে পরিচিত। এই ধরনের কাদার মধ্যে কেওলিন বা চীনামাটি অন্যতম। আমরা এখানে প্রধানত সাধারণ কাদামাটির কথাই আলোচনা করব। সাধারণ কাদামাটি দ্বিতীয় পর্যায়ের জিনিস। এতে পাথরের অবশিষ্টাংশ ছাড়া নানা ধরনের জৈব পদার্থ ও অন্যান্য জিনিস মিশে থাকে। কাদামাটির পাত্রকে সাড়ে চারশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে সাড়ে সাত বা আটশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় পোড়ালে অধিকাংশ সহজলভ্য ধরনের মৃৎপাত্র তৈরি করা যায়।

মাটির পাত্রের ব্যবহার কখন থেকে শুরু

পৃথিবীতে মৃৎপাত্রের প্রচলন প্রথম কিভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। মনে হয়, মানুষ চামড়ার তৈরি আধার, লাউ-জাতীয় ফলের খোলা প্রভৃতির ব্যবহার শিখেছিল মৃৎপাত্রের আগেই। ঝুড়ি বোনার কাজও মৃৎপাত্রের চেয়ে পুরোনো। ঝুড়ির গায়ে কাদামাটি লাগিয়ে নিশ্ছিদ্র করার প্রচেষ্টা প্রথমে হয়েছিল বলেই মনে হয়। তারপর ঝুড়ি আগুনে পুড়ে গিয়ে মৃৎপাত্রের আভাস সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে থাকবে। নব্য-প্রস্তর যুগের গোড়ার দিকে শস্যের দানা ও পশুদের দুধ রাখার এবং রান্নাবান্না করবার জন্যে হয়ত মৃৎপাত্রের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

প্রাচীন কালে কী করে মাটির পাত্র তৈরি করা হত

একেবারে প্রাচীন ধরনের মৃৎপাত্র হাতেই তৈরি করা হত। মৃৎপাত্র দেখে, সেটি হাতে তৈরি করা কি না তা বলা যায়। পাত্র গড়ার আগে কাদামাটি মেখে নিয়ে দড়ির আকারে পাকিয়ে নেওয়া হত। তারপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই দড়ির মত পাকানো কাদা দিয়ে পাত্রের চারদিকের ধার তৈরি করা হত। বলা বাহুল্য, পাত্রের

তলার দিকে একতাল কাদা সমান করে রেখে নিয়ে তার উপরেই ঐ পাকানো দড়ির পদ্ধতির কাজ চলত। কখনো বা আলাদা কাদামাটির তাল থেকে গোল করে বেড় তৈরি করে নিয়ে সেগুলিকে একটার উপর আর একটা চাপিয়ে পাত্রটি সম্পূর্ণ করা হত। প্রাথমিক কাজটি হয়ে গেলে ভিতরে একটি হাত ও বাইরে একটি হাত রেখে বেড়গুলি মিলিয়ে দেওয়া হত। খুব ছোট ধরনের পাত্র তৈরি করতে হলে বুড়ো আঙুলটি একতাল কাদার মধ্যে চেপে চেপে একটা গর্ত তৈরি করার পর সেটাকে হয়ত একটা বাটির গড়ন দেওয়া হত। একখণ্ড কাঠ বা পুরোনো ভাঙা মৃৎপাত্রের খোলাকে তলায় রেখে নতুন মৃৎপাত্র গড়লে গড়বার পাত্রটিকে চারিদিকে ঘোরাবার সুবিধে হত। সে যাই হোক, শত চেষ্টা করলেও হাতে-তৈরি মৃৎপাত্র দেখে ভুল বোঝার সম্ভাবনা কম। বাইরে থেকে বেড়গুলির জোড় মিলিয়ে দিলেও পাত্রের ভিতরের দিকটা সম্পূর্ণ মসৃণ হয় না। ফলে জোড়গুলির মুখে মাটির পাত্র সহজেই ভেঙে যায়। হাতে তৈরি মাটির পাত্রের গড়নও শত চেষ্টা সত্ত্বেও সবদিকে সমান হয় না, কোন-না-কোন দিকে কম-বেশি বেঁকে যায়। কখনো বা বেশি গোল বা লম্বা হয়ে পড়ে। পাত্রটির আকৃতিতে সাম্যের অভাবই পাত্রটির গঠন-পদ্ধতিকে চিনিয়ে দেয়।

কাদামাটির কথা আমরা আগেই বলেছি। শুধুমাত্র কাদামাটিতে পাত্র তৈরির কাজ ভাল হয় না। মাটির অত্যধিক আঠালো ভাবকে কাটাবার জন্যে মাটি মাখবার সময়ে মাটির সঙ্গে কাটা ঘাস, খড়কুটো, তুষ, ভূষি, ঝিনুকের গুঁড়ো, এমনকি পুরোনো পাত্র ভাঙার গুঁড়োরও ব্যবহার হয়ে থাকে। এই ধরনের নানা জিনিস ব্যবহার করলে পোড়ানোর সময়ে পাত্র ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। মিশ্রিত পদার্থের ধরন এবং পরিমাণের সঙ্গেও প্রাচীন দিনের জীবন-যাত্রার যোগাযোগ আছে। কারণ সব ধরনের মিশ্রিত জিনিস সব জায়গায় পাওয়া যায় না।

পাত্রগুলি তৈরি করার পর সেগুলো সামান্য নরম থাকতে থাকতে ক্ষোদাই করে নেওয়া হয়। কখনো বা পাত্রের গায়ে নানাজাতীয় দাগ কেটে বা দাঁত-ওয়ালা ঝিনুক দিয়ে ফুটকি দিয়ে নক্সা কাটা হয়। শেষকালে এক-টুকরো মসৃণ হাড় বা নুড়ি-পাথর পাত্রের গায়ে ঘসে ঘসে পাত্রটিকে চকচকে করা হয়ে থাকে। এর ফলে পাত্রটি বেশ জল-নিরোধক ও নিশ্ছিদ্র হয়ে ওঠে। অনেক সময়ে পাত্রে অতি সূক্ষ্ম কাদা-জলের একটা আস্তরণ দেওয়া হয়। আগুনে পোড়াবার জন্যে একটা মসৃণ আবরণ এর ফলে তৈরি হয়।

পোড়ানোর ফলেও মৃৎপাত্রের রঙের তারতম্য হয়। পোড়াবার সময়ে মাটির যে অংশ অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে সেই অংশের রঙ হয় লাল, অন্য অংশের রঙ হয় কালো। অবশ্য মাটির মধ্যকার রাসায়নিক গঠনও এর জন্যে দায়ী। সাধারণত মাটির পাত্রের তলার দিকটা উপরের দিকের চেয়ে মোটা হয়। একেবারে গোল-তলা-বিশিষ্ট পাত্র আগুনের উপরে রেখে রাঁধবার পক্ষে বেশি সুবিধেজনক। সমস্ত পাত্রের মধ্যে সম-পরিমাণের তাপ বিকিরণের ফলে এই ধরনের পাত্র আগুনের উত্তাপে সহজে ফেটে যায় না।

নানাদেশের প্রাচীন মৃৎপাত্র

সভ্যতার একেবারে প্রথম যুগের মৃৎপাত্র পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন শহর জেরিকো ও ইরাকের কালাত জারমো নামে একটি গ্রাম থেকে পাওয়া গিয়েছে। এ-সব এখন থেকে সাত আট হাজার বছর আগেকার তৈরী বলে মনে করা হয়। মিশরের রাজা ফারাওদের যুগ আরম্ভ হওয়ার বেশ কয়েক সহস্র বছর আগেকার; প্রাগৈতিহাসিক মিশরীয় সভ্যতার প্রায় সমস্ত বিবরণ জানার সুবিধে হয়েছে ফায়ুম, মেরিম্‌দে, বাদারি, দীর তাসা প্রভৃতি স্থান থেকে পাওয়া মৃৎপাত্রের সাহায্যেই। মিশরের এই যুগের মৃৎপাত্র থেকেই আমরা জানতে পারি যে, প্রাচীন

মৃৎপাত্র তৈরির অনুপ্রেরণা এসেছিল চামড়ার তৈরি আধার থেকেই। কেননা কালো রঙের পাত্রের কানায় চামড়ার পাত্রের মতই সাদা সেলাই করা নক্সা রয়েছে। এই ধরনের আর এক শ্রেণীর মৃৎপাত্রের গায়ে ঝুড়ির গায়ের বুননের অনুরূপ অলঙ্করণ দেখতে পাই আমরা। এই যুগেরই অপেক্ষাকৃত পরের দিকের বাদারীয় বা আমরীয় যুগের মৃৎপাত্রে অতি সুন্দর দুই রঙের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়, কারণ পোড়াবার সময়ে এই পাত্রগুলিকে উপুড় করে রাখা হত। মুক্ত বায়ুর স্পর্শ পেয়ে এর তলার দিকটা হয়ে উঠত লাল, আর ছাইয়ের গাদায় থাকা মুখ ও ভিতরের দিকটা হত কালো। মিশরের সভ্যতার বিকাশে দক্ষিণের নিগ্রো জাতিদের অনেক দান রয়েছে। মৃৎপাত্রের গায়ে আঁচড় দিয়ে আঁকা আফ্রিকার নানা প্রাণীর চিত্র থেকে সেটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। পাত্রের গায়ে জাদুগুণ-সম্পন্ন চিত্র বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতীক-চিহ্ন ছাড়া অন্য কিছু নয়।

প্রথম যুগের অন্যান্য মৃৎপাত্রের মধ্যে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের অল্ উবায়েদ্ ও টেল্ হালাফ্-এর মৃৎপাত্র প্রত্নতত্ত্বের যুগ-বিচারে বিশেষ সাহায্য করেছে। এ ছাড়া ইউক্রেনের ত্রিপোলাই ও দানিয়ুব অঞ্চলের কয়েকটি বিশেষ ধরনের মৃৎপাত্র এবং চীন দেশের উত্তরে ইয়াং শাও গ্রামে পাওয়া মৃৎপাত্র খুবই উল্লেখ করবার মত। সৌন্দর্যের দিক থেকে ইয়াং শাও মৃৎপাত্র অতুলনীয়। এতে গুটোনো ও পাক-খাওয়া রেখার মোটা মোটা টান দিয়ে অতি সুন্দর নক্সা কাটা হয়েছে। এই পাত্রগুলির সঙ্গে পূর্ব-ইউরোপের পাত্রগুলির অঙ্কন-রীতির একটা মিল দেখা যায়।

ব্রোঞ্জের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর তৎকালীন জন-সমাজ এগিয়ে চলল। মৃৎপাত্র তৈরি করার কাজটা নব্য-প্রস্তর যুগের মত গৃহস্থালীর অঙ্গ হয়ে রইল না। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন-গড়ে-ওঠা নগরগুলোতে বেশ চাহিদা সৃষ্টি হল নানা ধরনের মৃৎপাত্রের। যাতে দ্রুত বহুসংখ্যক পাত্র তৈরি করা যেতে পারে

সেজন্যে কুমোরের চাকের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল মেসোপটেমিয়ায়। সে এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই যুগের নাম দিয়েছেন উরুক যুগ। মিশর দেশে কুমোরের চাকের প্রচলন হয়েছে তার অনেক পরে, পঞ্চম রাজবংশের আমলে। দ্রুত ঘূর্ণায়মান চাকের প্রবর্তন হয়েছে মধ্য-রাজবংশের যুগে। কিন্তু পাথর, সোনা, রুপো, তামা বা ব্রোঞ্জের পাত্রই মিশর ও মেসোপটেমিয়ার সভ্যতায় বেশ ব্যবহৃত হত। সেই কারণে এই আমলে বাইরের অলঙ্করণের উৎকর্ষের দিক দিয়ে এই দুই দেশের মৃৎপাত্র খুব বেশি পারদর্শিতা দেখাতে সমর্থ হয় নি।

অন্যদিকে গ্রীসদেশের নিকটস্থ ক্রীট দ্বীপে গ্রীস্টপূর্ব দুই হাজার বছরের পর থেকে অতি সুন্দর মৃৎপাত্র তৈরি হতে থাকে। এই সময়ের ক্রীটের মৃৎপাত্রে ধাতুর তৈরি পাত্রের গড়নের অনুকরণ করা হয়। অতি পাতলা খোলার ক্রীটীয় মৃৎপাত্র পূর্ব-ভূমধ্যসাগর এলাকায় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। পিরামিডের অভ্যন্তরের চিত্র, মিশরের আবিদস্, কাহুন প্রভৃতি প্রাচীন স্থান, এবং সিরিয়ার উগরাইত নামক প্রাচীন শহর থেকে আমরা ক্রীটীয় মৃৎপাত্রের নিদর্শন পাই। এই সময়কার সবচাইতে সুন্দর মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে ইরাক ও পারস্যের উচ্চ ভূমির নানা স্থান থেকে এবং বালুচিস্তানের পাহাড়ি গ্রামগুলিতে। এ-ধরনের পাত্রের গায়ে মানুষ, গাছপালা ও নানা পশুপক্ষীর দেহ সুন্দর এবং শিল্পসঙ্গত নক্সার আকারে আঁকা হত। এই ছবি সাধারণত মৃৎপাত্রের গায়ের চারদিকে দাগ-দেওয়া ঘরের মধ্যেই আঁকার প্রথা ছিল। চীনদেশের এইসময়কার মৃৎপাত্র শাঙ বংশীয় রাজাদের সমাধি থেকেই প্রধানত পাওয়া গেছে। এই সময়ে চীনদেশে কুমোরের চাকিতে তৈরি ও হাতে তৈরি এই উভয় রকমের পাত্রেরই চলন ছিল বলে মনে হয়। তা ছাড়া চীনা-মাটির তৈরি পাত্রের চলনও এই সময় থেকে শুরু হয়েছিল চীনদেশে। পিতৃপুরুষদের তর্পণ ও আরাধনার কাজে অতি সুন্দর ব্রোঞ্জের

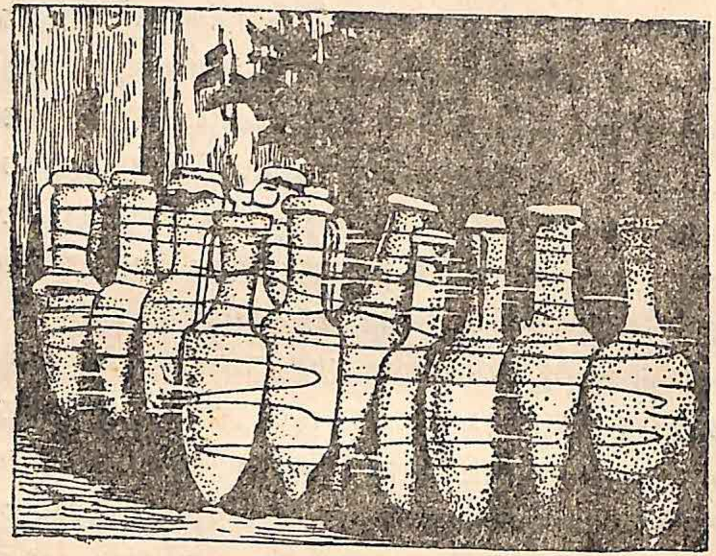
তৈজসপত্র ব্যবহার করা হত। এগুলিও এইসময়কারই তৈরি এবং এ-সব বানানো হয়েছিল এর আগের যুগের মৃৎপাত্রের অনুকরণেই।

চীনের মত প্রাচীন জাপানেও প্রাগৈতিহাসিক মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। জাপানের প্রাচীন মৃৎপাত্রের মধ্যে 'জোমোন' মৃৎপাত্র খুবই বিখ্যাত। নব্য-প্রস্তর যুগ ও তার শেষের দিকে এই ধরনের পাত্রের চল ছিল জাপানে। এতে পাকানো দড়ির মত এবং ঢেউ-খেলানো নক্সা দেখা যায়। চীন এবং জাপান এই উভয় দেশেই পরবর্তীকালে মৃৎপাত্র তৈরির ব্যাপারে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। ইতিহাস-বিচারে এইগুলির গুরুত্বও উল্লেখ করবার মত।

প্রাচীন কালের আমেরিকাতেও মৃৎপাত্রের প্রচলন বহু দিনের। খ্রীস্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগে পেরু ও মেক্সিকোতে প্রথম মৃৎপাত্রের চলন হয়। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতায় যে অতি সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় নক্সা-করা কাপড় পাওয়া গেছে সেইগুলির সঙ্গে মৃৎপাত্রের নক্সার একটা মিল দেখা যায়। এই সময় ও এর পরের যুগের উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের নানাস্থানে অ-সংস্কৃত ধরনের চওড়া-মুখওলা 'বেলবীকার' নামক পাত্রের চলন দেখা যায়।

যাই হোক, প্রাচীন মৃৎপাত্রের কথায় আমরা যদি আবার ক্রীট ও গ্রীস দেশের আশে-পাশে একটু ফিরে যাই তাহলে ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে মৃৎপাত্রের প্রয়োজনীয়তা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারব। প্রাচীন ক্রীট ও গ্রীস দেশের মৃৎপাত্রকে অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা হয়েছে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরোনো এই দুটি সভ্যতার বিভিন্ন যুগের বিশেষ ধরনের মৃৎপাত্রের গঠন-পদ্ধতি, গুণাগুণ, ব্যবহার, অলঙ্করণ প্রভৃতি অতি সুন্দর। বিভিন্ন সময়ের মৃৎপাত্রের নামও দেওয়া হয়েছে ভিন্ন-ভিন্ন। এ-সব নামের সাহায্যে তৎকালীন সভ্যতার প্রতিটি স্তর সহজেই চেনা যায়।

প্রথম দিকে ক্রীট ও গ্রীসের মৃৎপাত্রের নামকরণ করা হয়েছে প্রত্ন-আবিষ্কারের স্তর অনুযায়ী। শেষের দিকে ক্রীট দ্বীপ ও গ্রীসের



ফরাসী বন্দর মার্সাইএর নিকট সমুদ্রের তলায় প্রাপ্ত প্রাচীন ইতালীয় মৃৎপাত্র

মূল ভূখণ্ডের পাত্রসম্ভারকে চেনবার জন্যে 'মাইকেনীয় পরবর্তী', 'প্রায়-জ্যামিতিক', 'জ্যামিতিক', 'করিন্থিয়ান', 'পূর্বদেশ অনুযায়ী' প্রভৃতি বিশেষণগুলি আরোপ করা হয়েছে। গ্রীক মৃৎশিল্পের সবচেয়ে সুন্দর নিদর্শন অবশ্য এর পরবর্তীকালের। এই পাত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ধাতুর তৈরি পাত্রের অনুকরণে নির্মিত। কালো ও লাল মূর্তি আঁকা মৃৎপাত্র এ-সবের মধ্যে প্রধান। এই ধরনের গ্রীক মৃৎপাত্র ইতিহাসের বিচারে খুবই মূল্যবান, কারণ এতে অনেক ক্ষেত্রেই পাত্রটির গায়ে শিল্পীর নাম লেখা থাকত। তা-ছাড়া পাত্রের গায়ে আঁকা ছবিতে গ্রীক পুরাণের কাহিনী ও সাধারণ জীবন-যাত্রার অতি সুন্দর সুন্দর বিবরণ থাকত। এই যুগের গ্রীক মৃৎপাত্র বিচার করে গ্রীসের প্রভাবাধীন অঞ্চল এবং গ্রীস ও তার পার্শ্ববর্তী

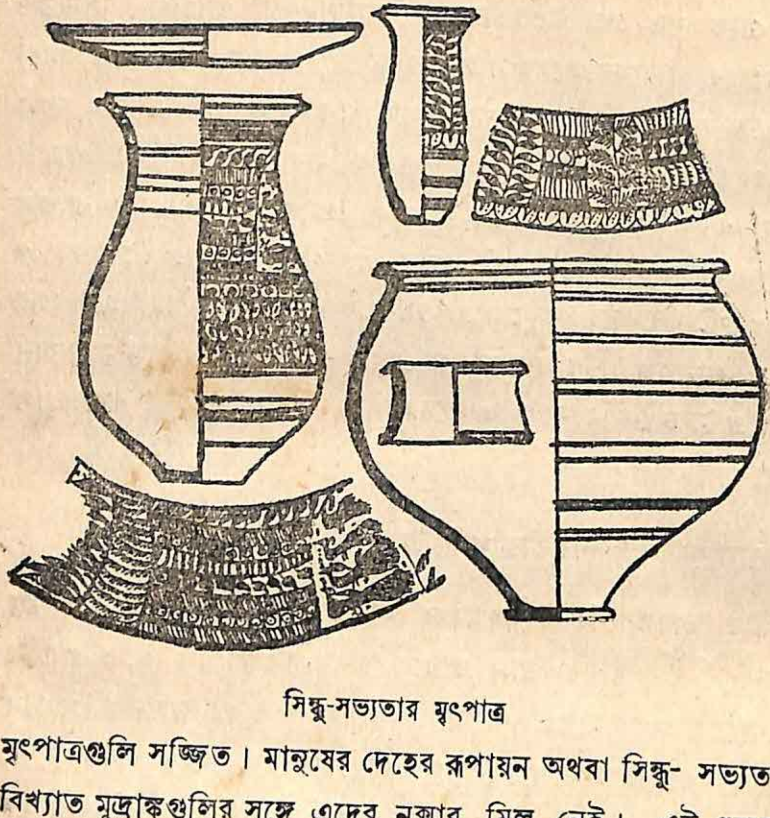
দেশগুলির মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক সংবাদ পাওয়া গেছে।

গ্রীক সভ্যতার পরবর্তীকালে রোম্যানদের প্রাধান্যের সময়েও মৃৎপাত্রের সাহায্যে রোমের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সংযোগের কথা আমরা জানতে পেরেছি। এ সম্পর্কে সামিয়ান নামে এক ধরনের লাল রঙের মৃৎপাত্রের কথা উল্লেখ করবার মত। ধাতুর তৈরি পাত্রই ছিল এ-ধরনের মৃৎপাত্র তৈরির মূল প্রেরণা। তা-ছাড়া এগুলি পোড়া মাটির ছাঁচ দিয়ে তৈরি করে এর গায়ে সামান্য উঁচু নক্সা ও ছবির সৃষ্টি করা হত। কুমোরের চাকিতে মাটির পাত্র তৈরি হলে তার গায়ে আঙুলের চাপে সমান্তরাল রেখার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সামিয়ান মৃৎপাত্র ছাঁচে তৈরি বলে এ-সবের গায়ে এমনি ধরনের সমান্তরাল রেখা দেখা যায় না।

প্রাচীন কালের ভারতীয় মৃৎপাত্র

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসেও মাটির পাত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যময় স্থান রয়েছে। বালুচিস্তানের অতি প্রাচীন মৃৎপাত্রের কথা আমরা আগেই বলেছি। তবে, ভারতের প্রাচীন মাটির পাত্রের মধ্যে সিন্ধুর মহেঞ্জোদাড়ো ও চানহুদাড়ো, পাঞ্জাবের হরপ্পা, গুজরাটের লোথাল এবং সিন্ধু-সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত নানান জায়গা থেকে একটি বিশিষ্ট ধরনের মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে। গড়নের দিক দিয়ে সিন্ধু-সভ্যতার মৃৎপাত্রে একপায়া থালা, ছুঁচলো মুখের ছোট্ট খুরি এবং ঐ ধরনের বড় চওড়া-মুখের জালা, ঢাকা-দেওয়া ও মুখ-খোলা বাটি, লম্বাটে অনেক-ছিদ্রওয়ালা এক ধরনের পাত্র এবং গুড়ের নাগরির আকারের ছোট বড় জালাই প্রধান। সিন্ধু-সভ্যতার সময়ে তৈরি পাত্রের গায়ে আঁকা অলঙ্কার ভারতের একেবারে নিজস্ব জিনিস। মাটির পাত্রের লাল রঙের গায়ে কালো রঙ দিয়ে আঁকা এ-সব চিত্র সৌন্দর্যে অতুলনীয়। অশ্বত্থ গাছের

পাতা, সাধারণ লতাপাতা, গাছের সারি, পরস্পরকে-কেটে-যাওয়া বৃত্তের নক্সা, ময়ূর, হরিণ, ঢেউ-খেলানো রেখা প্রভৃতি দিয়ে এই

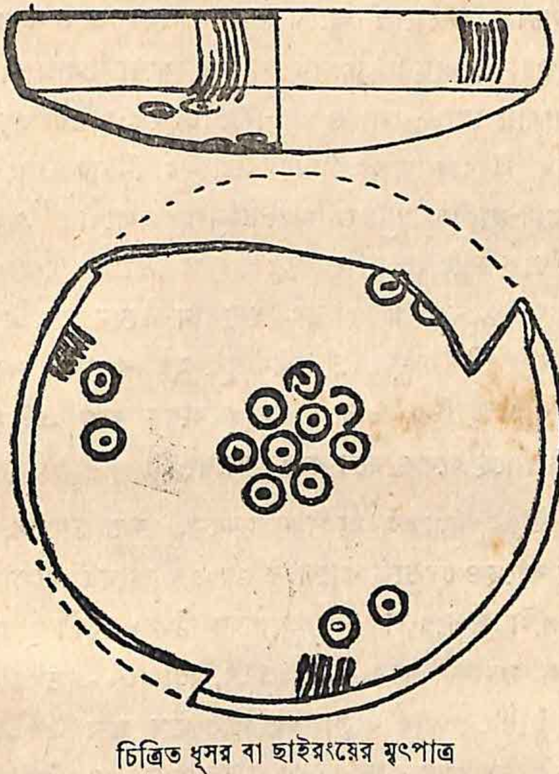


সিন্ধু-সভ্যতার মৃৎপাত্র

মৃৎপাত্রগুলি সজ্জিত। মানুষের দেহের রূপায়ন অথবা সিন্ধু- সভ্যতার বিখ্যাত মুদ্রাঙ্কগুলির সঙ্গে এদের নক্সার মিল নেই। এই ধরনের ঘনসন্নিবিষ্ট এবং লালের উপর কালো দিয়ে নক্সা-আঁকা মাটির খোলামকুচিই প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার বহু কেন্দ্র চিনতে সাহায্য করে।

সিন্ধু-সভ্যতার অবসানের শেষ দিকে এবং তার পরের কালেও ভারতের নানা অংশে কয়েকটি মৃৎপাত্রের অঞ্চল পাওয়া গিয়েছে। এই সম্পর্কে বর্তমানে অনেক বিচার ও গবেষণা চলেছে। তাম্র-প্রস্তর যুগের এইসব কিঞ্চিৎ-পেছিয়ে-পড়া জনসমাজের খবর পাবার পক্ষে মৃৎপাত্রই অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। এ ধরনের পাত্রগুলির মধ্যে মধ্যপ্রদেশের নাভ্‌দাটোলি নামক জায়গা থেকে উপরদিকটা

খোলা নলওয়ালা এক ধরনের বাটি পাওয়া গেছে। এ-সব বাটির গঠন দেখে অনেকে মনে করেন যে, ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিম



চিত্রিত ধূসর বা ছাইরংয়ের মৃৎপাত্র

এশিয়ার পারস্য দেশ ও আনুষঙ্গিক প্রত্ন-অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক যোগাযোগ বর্তমান। মাটি অথবা ধাতু দিয়ে তৈরি এ-ধরনের পাত্র নির্মাণের প্রেরণা বহির্ভারতের ঐ-সব অঞ্চল থেকে পাওয়া বলেই মনে হয়।

এরও পরের যুগের মৃৎপাত্র ধূসর রঙের চিত্রিত পাত্র রূপে পরিচিত। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের নানা জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননের কাজ চালাতে গিয়ে এইধরনের মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে। ব্রোঞ্জের তৈরি জিনিসপত্র প্রায় সব সময়েই এইসব পাত্রের কাছাকাছি দেখা যায়।

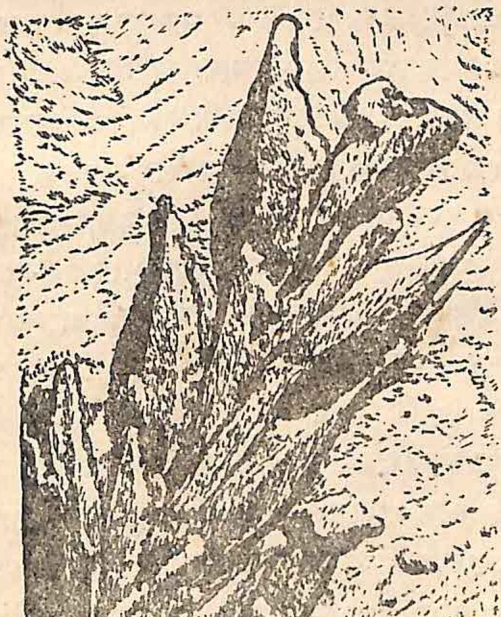
সূক্ষ্ম কণার কাদামাটি বেশ ভাল করে মিশিয়ে কুমোরের চাকেই তৈরি করা হয়েছে এ-সব মৃৎপাত্র। এদের গায়ে রয়েছে নানারকমের

নক্সা, যেমন—গোলাকার রেখার মধ্যে ফুটকি, সোজা, বাঁকানো, সামান্য কাঁপানো বা পাকানো রেখা প্রভৃতি। পাত্রগুলোর খোলা বেশ পাতলা। ব্যবহারের আগে এগুলো বেশ ভাল করে আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। এ-সব পাত্রের মধ্যে সোজা-ধারওয়ালা বাটি এবং সামান্য-গোল-তলা ও অল্প-ভিতরে-ঢুকে-যাওয়া কানাওয়ালা থালা উল্লেখ করবার মত। স্তর-বিন্যাসের বিচার এবং প্রাচীন ভারতের আর্য-জাতি-অধ্যুষিত গঙ্গা-যমুনার জলধৌত মধ্য-দেশের এবং মহাভারতে উল্লিখিত হস্তিনাপুর প্রভৃতি জায়গা থেকে পাওয়া গিয়েছে বলে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুমান করেন যে, এ-সব পাত্র খ্রীস্টপূর্ব একাদশ শতক থেকে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যে তৈরি হয়েছে। আর্য জাতির ভারতে অনুপ্রবেশের সঙ্গে এই মৃৎপাত্রের একটা সম্বন্ধ আছে বলেও মনে করেন অনেকে।

সমগ্র উত্তর-ভারতের ব্যাপক অঞ্চলে, মধ্য-ভারতে, এমনকি কৃষ্ণা নদীর কাছেও চকচকে কালো রঙের এক ধরনের মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। এগুলি উপরে-বর্ণিত মৃৎপাত্রের ঠিক পরবর্তী যুগের। এই পাত্রগুলিকে পরীক্ষা করে মনে হয় যে, প্রায় ৮০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় পুড়িয়ে নেওয়ার আগে এগুলিতে ঘষে ঘষে একটা পালিশ দেওয়া হত। তারপর কাদাজলের আস্তরণে ডুবিয়ে ভাঁটির মুখ বন্ধ করে পাত্রটির রঙ কালো করা হত। এই পাত্রগুলির গঠনের সঙ্গে ধূসর বর্ণের পাত্রের একটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন তক্ষশিলায় এবং অন্যান্য জায়গায় এর অবস্থানের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায় যে, এই শ্রেণীর মৃৎপাত্র খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীকালের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এর পরেও কোন-কোন জায়গায় এর নকল করে এক ধরনের পাত্র তৈরি হয়েছিল। এ-সব পাত্রের গায়ে আঘাত করলে তা থেকে ধাতুর তৈরি পাত্রের মত আওয়াজ বেরোয়।

ভারতের উপকূল ভাগের নানা স্থানে, বিশেষ করে দক্ষিণ-ভারতের

পণ্ডিচেরির নিকটস্থ আরিকামেডু নামক একটা জায়গা থেকে খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী-কালের রোমান মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে। এদের নাম 'আরেটাইন, এবং 'রুলেটেড্' মৃৎপাত্র। এর সঙ্গে পাওয়া মুখের কাছ থেকে কাঁধ পর্যন্ত দুই দিকে দুটি সোজা হাতল থাকা 'অ্যাম্‌ফোরা'ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের। দক্ষিণ ভারতের রোমক বাণিজ্যের কেন্দ্র-গুলিতে রোম্যান মুদ্রার সঙ্গে এই ধরনের মৃৎপাত্রের অবস্থিতি দেখা যায়। 'রুলেটেড্' পাত্রগুলি ধূসর, অথবা কালো রঙের। খোলা পাতলা। রুলেটেড থালার বৈশিষ্ট্য হল এই যে এদের ভিতরের দিকে মাঝখানে থাকে অনেকগুলো ক্ষোদাই-করা ফুটকি বা ছোট রেখার সারি দিয়ে করা দাগের বৃত্ত। বর্তমান কালে ভারতীয় প্রত্ন-তত্ত্বে এইসব মৃৎপাত্র কোন একটি প্রাচীন জায়গার সময়-নির্ধারণে বিশেষ সাহায্য করে থাকে। এ-ছাড়া দক্ষিণ ভারতের মহা প্রস্তরীয়



বাগদাদের নিকট প্রাপ্ত সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন ইঁটের গায়ে যবের ছাপ

সমাধিগুলিতে খ্রীস্টীয় শতকের পূর্বেকার একরকমের তলার দিকে লাল এবং ভিতর ও উপর দিকে কালো পাত্র দেখতে পাওয়া যায়।

মৃৎপাত্রের সাহায্যে সময় বিচার ছাড়াও অন্যান্য অনেক ধরনের সংবাদ পাওয়া যায়। মৃৎপাত্র তৈরি করবার সময়ে নানারকম শস্যের দানা পাত্রের নরম গায়ে আটকিয়ে যায়। পাত্র পোড়ানো হয়ে যাবার পর দানাটি বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু তার একটা ছাপ পাত্রের গায়ে থেকে যায়। এই ছাপের প্রকৃতি দেখে প্রত্নতাত্ত্বিক তৎকালীন অধিবাসীদের খাদ্য-গ্রহণের ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। এইভাবে জনৈক প্রত্নতাত্ত্বিক অতি সুন্দরভাবে প্রাচীন ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের নব্য-প্রস্তরীয়, ব্রোঞ্জ, লৌহ, রোম্যান ও অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগে বার্লি, ওট ও গমের ব্যবহারের পরিমাণ নির্দিষ্ট করেছেন। পশ্চিম-এশিয়ার মৃৎপাত্র নিয়েও এ-ধরনের পরীক্ষা হয়েছে। আণবিক বিকিরণের সাহায্য নিয়ে মধ্য-আমেরিকার কোন-কোন অঞ্চলের মৃৎপাত্রের রাসায়নিক উপাদান বের করে তার সাহায্যে আপাতদৃষ্টিতে একই রকম দেখতে পাত্রের সত্যিকারের উৎপত্তি-স্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

মাটির পাত্রকে প্রত্নতত্ত্বের কাজে ব্যবহার করতে হলে নিখুঁতভাবে তাদের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে হয়। খননকার্য চালাতে গিয়ে যে স্তরগুলিতে মৃৎপাত্র বা পাত্রের অংশ পাওয়া যায় সেগুলিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রাখতে হয়। নানা আকারের ভাঙা টুকরো অংশগুলিকে খুব ধৈর্য সহকারে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ পাত্র গড়ে তোলাও একটি বিশেষ কাজ। পাত্রের কানা, তলার দিক ও যেখানে যেখানে পাত্রের আকার বাঁকানো হয়েছে সেইগুলিকে প্রথমেই বেছে নিতে পারলে কাজটা অনেকটা সহজ হয়ে যায়।

কোন প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের ফলাফল লিপিবদ্ধ করার সময়ে মৃৎপাত্রের কথা ভুলে গেলে চলবে না। মৃৎপাত্রের আকার বোঝাবার জন্যে পাত্রটির নানা চিত্রের সাহায্য নিতে হয়। তা ছাড়া পাত্রটির বাইরের দিকের নক্সাও চিত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে প্রকাশ করতে হয়।

৫

সমাধির কথা

প্রাচীন সভ্যতার বিবরণ জানতে গেলে অতীত কালের সমাধি সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। মৃত্যুর পরে মৃতদেহকে নানা-রকম পদ্ধতিতে সমাধি দেওয়ার প্রথা অতি পুরোনো দিন থেকেই প্রচলিত ছিল। প্রাচীন কালের মানুষ মৃতের মঙ্গল কামনায় সমাধির মধ্যে নানারকমের জিনিসপত্র দিয়ে রাখতেন। সমাধির মধ্যে মৃতদেহকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে রাখা হত। এইসব কারণে আমরা সমাধির ভিতরে পাওয়া নানা দ্রব্যের মাধ্যমে প্রাচীন কালের মানুষ ও তার আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর এইসব আচার ব্যবহার ও প্রথা ছিল ভিন্ন-ভিন্ন। এর ফলে নতুন ধরনের প্রথার প্রচলন ও পুরোনো ধরনের প্রথার বিলোপ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, পৃথিবীর কোন একটি দেশে এক নতুন জাতিগোষ্ঠী পুরোনো সমাজ ও জাতিদের কিভাবে ও কখন পরাজিত করল, কিভাবেই বা বিজয়ীদের সামাজিক প্রথা জয়যুক্ত হল। এ ছাড়া নানারকমের জিনিস ও তৈজসপত্র একটি সমাধির মধ্যে একই সময়ে প্রোথিত হয় বলে আমরা জানতে পারি, ঐগুলি কোন একটি বিশেষ যুগে প্রচলিত ছিল। সুতরাং আপেক্ষিক ও নিশ্চিত প্রাচীনত্ব বা কাল নিরূপণের কথায় সমাধি, সমাধি দানের পদ্ধতি এবং অন্ত্যেষ্টি-প্রথার চিহ্ন আবিষ্কার প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

সমাধিতে কী কী জিনিস পাওয়া গেছে

প্রাচীন প্রস্তর-যুগের শেষার্ধ থেকেই পৃথিবীর নানা অঞ্চলে বহু প্রাচীন সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব সমাধি অনেক সময়

পাহাড়ের গুহা প্রভৃতির মধ্যে অবস্থিত ছিল। তা ছাড়া এই সমাধিগুলির মধ্যে একটা মিল দেখা যায়। প্রথমত, প্রাচীন প্রস্তর-যুগের যাযাবর মানুষ সমাধির স্থানটি ও মৃতদেহকে লৌহ-ঘটিত লাল মাটির রঙে সজ্জিত করত। ঘুমোনোর ভঙ্গিতে শয়ান এইসব মৃতদেহের কাছ থেকে পাহাড়ি ছাগলের শিং, বুনো শিয়ালের দাঁত, প্রাচীন কালের ম্যামথ-জাতীয় হাতির মাথার খুলি প্রভৃতি পাওয়া গেছে। এরই কাছাকাছি পাওয়া গেছে পোড়া মাটি অথবা ছাই। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রাচীন মানুষ রক্তের লাল রঙকে জীবন-শক্তির আধার বলে মনে করত। মৃতদেহের কাছাকাছি বন্য জন্তুর হাড়গোড় রেখে মৃত লোকটির পরকালের জীবনে খাদ্যের উপযুক্ত প্রাণীর ব্যবস্থা করা হত। মৃতদেহের কাছে পোড়ামাটি ও দগ্ধ হাড়গোড় মৃত ব্যক্তির কল্যাণ-কামনায় আনুষ্ঠানিক রন্ধন ও ভোজনের চিহ্ন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এর পরবর্তী-কালে, অর্থাৎ মধ্য-প্রস্তর যুগেও একক অথবা যৌথ সমাধিদান প্রথার প্রচলন ছিল। এইসময়কার সমাধিগুলি আগের মতই বাসস্থানের নিকটে অথবা বাসস্থানের মধ্যেই অবস্থিত ছিল। এ থেকে মনে হয় যে, প্রাচীন কালের মানুষের মধ্যে মৃতদেহ সম্পর্কে অহেতুক ঘৃণা বা বিরূপতা ছিল না। বরঞ্চ সমগোষ্ঠীর মৃতদেহা-বশেষকে শক্তিদায়ক ও মঙ্গলকর বলেই মনে করা হত।

নব্য-প্রস্তর যুগে কৃষিকাজ ও পশুপালনের সূচনা হয়। ক্রমে গ্রাম ও প্রথম শহরের উৎপত্তি হতে থাকে। শস্যের সম্ভার ও পশুর দুধ প্রভৃতি রক্ষা করা ও রন্ধনের জন্যে প্রয়োজনীয় মৃৎপাত্রের উৎপত্তিও এই সময়েই হয়েছিল। প্রাচীনতম মৃতপাত্রের বহু নিদর্শন এই যুগের সমাধির মধ্য থেকেই পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে প্যালেস্টাইনের জেরিকো শহরের প্রাচীনতম অংশ ও প্রাগৈতি-হাসিক মিশরের সমাধিক্ষেত্রগুলি খুবই বিখ্যাত। কৃষিকর্মের প্রসার হওয়ায় এ যুগে সুজলা সুফলা মাটিকে বন্দনা করবার প্রথাও

চালু হয়েছিল। সমস্ত উর্বরতার শক্তিধারিণী মাতৃদেবীর কল্পনা ও বাস্তব রূপায়ণও এই যুগের। এইসময়কার সমাধি থেকে মাতৃমূর্তিও পাওয়া গেছে। মৃতদেহ মাটির মধ্যে প্রোথিত করার প্রথার সঙ্গে এর একটা যোগ আছে বলেই মনে হয়।

ক্রমে মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতি আরও বদলে গেল। তামা ও ব্রোঞ্জের আবিষ্কার হওয়ার ফলে শিল্প ও কৃষির উৎপাদন আরও বেড়ে গেল। উত্থান হল রাজতন্ত্রের। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন স্থান, মিশর এবং চীন দেশে আবিষ্কৃত এই যুগের সমাধিগুলি থেকে আমরা সর্বপ্রথম নানা শ্রেণীতে বিভক্ত পরাক্রান্ত রাজা-রাজড়া ও সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার একটা পরিচয় পেতে পারি। এখন থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার একটি চীনদেশীয় সমাধির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শাঙ-বংশীয় এক রাজার এই সমাধিতে প্রায় আড়াই হাজার বর্গ-ফুট পরিমিত মাটি খুঁড়ে নেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে তলায় সমাধির মধ্যস্থলে একটা সুন্দর রঙিন লাক্ষার ঘর। এতে রাজা, রানীরা এবং সৈন্যসামন্তদের দেহ ও ঘোড়াশুদ্ধ যুদ্ধ-রথ পাওয়া যায়। এ দেহগুলি বিভিন্ন অলঙ্কার ও ভূষণে সজ্জিত। এর উপর মাটি ফেলে তারপর কয়েক শত বন্দী ক্রীতদাসের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদাভাবে সমাধিস্থ করা হয়েছে। এদের দেহে অলঙ্কারের বাহুল্য নেই। চাষী মজুরের কাজ করার উপযোগী নানা সরঞ্জাম, যেমন—শস্য গুঁড়ো করবার জাঁতা, কুড়ুল ও ছোট-ছোট ব্রোঞ্জের ছুরি দেওয়া হয়েছে। অনেকটা এইরকমই বীভৎসতার চিহ্ন দেখা যায় পশ্চিম-এশিয়ার প্রাচীন শহর উর-এর রাজকীয় সমাধিতে। এ সমাধিটি প্রায় খ্রীস্টপূর্ব সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার। এই সমাধি খুঁড়তে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ে পাঁচটি মৃতদেহ; তামার ছুরি আর কয়েকটি ছোট-ছোট পাত্র তাদের কাছাকাছি পড়ে আছে। তারপর দশ-জন নানা গহনায় সজ্জিতা রাজদরবারের পরিচারিকা। একটি

অত্যন্ত সুন্দর কারুকার্য-খচিত বীণা ও বীণাবাদকের কঙ্কাল, গাধায় টানা রথের সহিস ও গাধার কঙ্কাল এবং রাজার উপযুক্ত নানান জিনিস-পত্র পর-পর সাজানো রয়েছে। রাজার সমাধি-গৃহেও রয়েছে পরিচারক, পরিচারিকা, সৈন্য এবং বলদ-টানা রথ ও তার চালকদের কঙ্কাল। পাথরের সমাধি-গৃহে রাজা আব আর গির দেহ, তারও তলায় রানী শুব্ আদ-এর সমাধিকক্ষ। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক লিওনার্ড উলী অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই প্রাচীন সমাধি-গৃহের খননকার্য চালিয়েছিলেন। এই আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন উর-এর সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য জানতে পেরেছি।

আমরা যদি প্রাচীন মিশরের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলেও প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রাচীন সমাধির গুরুত্ব বুঝতে পারব। মিশরীয় অভিজাতগণ বিশ্বাস করতেন যে মৃত্যুর পরপারে মানুষ সূর্যদেবতা হোরাস অথবা পাতালের দেবতা ওসিরিসের কাছে ফিরে যায়। সেজন্যে মিশরীয় প্রাচীন কবরে জীবিত লোকের ব্যবহার্য সমস্ত দ্রব্যই রাখা হত। সমাধির কাছে থাকত সূর্যদেবের কাছে যাওয়ার জন্যে কাঠের অথবা ইটের নৌকো। মিশরের প্রাচীন ধরনের 'মাস্তারা'-নামক সমাধিগৃহ তৈরি হত রাজার প্রাসাদেরই অনুকরণে। এই সমাধিই কালে কালে মিশরের সম্রাট ফারাও জোসেরের আমলে ধাপে-ধাপে-উঠে-যাওয়া পিরামিডের রূপ নিয়েছিল। পিরামিডের মধ্য থেকে প্রাচীন মিশরের ঘর বাড়ি, আসবাব-পত্র, সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা, শিল্পকলা ও চিত্রলিপির সম্পর্কে খবর পেতে পারি। মিশরের প্রতাপশালী বড়-বড় লোকের পিরামিডের কাছে-পিঠে সাধারণ চাষী, মজুর ও কারিগর-শ্রেণীর লোকদেরও অনেক সমাধি অবস্থিত রয়েছে। এইসব সমাধির উপরে একটা করে ঢিপি থাকত। মৃতদেহগুলির কোনটাতে কাঠে ও পাথরে কাজ করবার যন্ত্রপাতি, তুলি-রঙ, মাংসের খণ্ড অথবা মাংস কাটার ছুরি পাওয়া গিয়েছে।

নানা ধরনের সমাধি

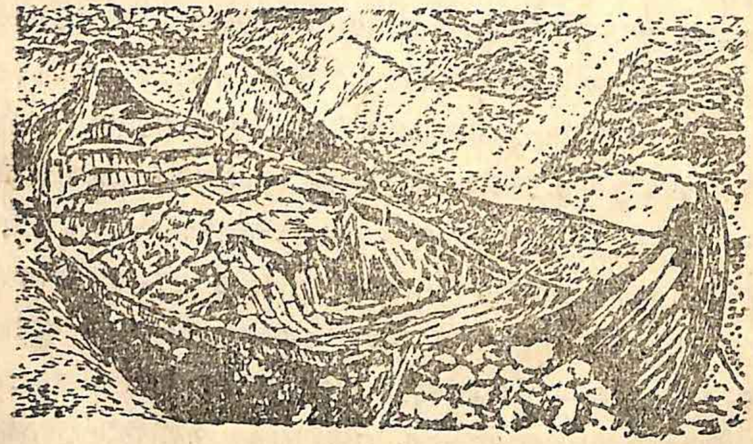
প্রাচীন গ্রীস দেশ ও তার নিকটবর্তী ক্রীট দ্বীপে পারিবারিক সমাধি-গৃহ অথবা গোষ্ঠীগত সমাধির কথা জানতে পারা যায়। এখানে বড়-বড় রাজা-রাজড়াদের জন্যে এক ধরনের ফাঁপা অর্ধ-গোলাকার বড়-বড় পাথরের চাঁই দিয়ে গড়া সমাধির প্রচলন ছিল। প্রাচীন গ্রীসে এর কয়েক শত বছর পরের সমাধি-ফলকে সুন্দর কারুকার্য-করা নানা ধরনের পাথরে খোদাই-করা ছবি থাকত। কাজে-কাজেই এগুলির সাহায্যে আমরা সৈন্য-সামন্ত, ক্রীড়াবিদ, বালক বালিকা এবং সাধারণ নাগরিকদের আচার ব্যবহার, বেশ-ভূষা প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারি।

প্রাচীনকালে তুর্কিদেশের নানান অঞ্চলে হিটাইট নামে এক সমৃদ্ধিশালী জাতির কথা জানতে পারা যায়। এই জাতির সমাধি-দান প্রথার সঙ্গে হোমারের 'ইলিয়াড' মহাকাব্যে বর্ণিত ট্রয়ের রাজপুরুষ হেক্টরের সমাধি-দান প্রথার বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে হিটাইটেরা যে বাইরে থেকে এসেছিল তার প্রমাণ দিচ্ছে হিটা-ইট রাজ্যের সাধারণ অধিবাসীদের বড়-বড় জালা বা কলসের মধ্যে রাখা মৃতদেহের সমাধিগুলি। প্রাচীন পারস্যের সমাধিগুলির সাহায্যে যুগে যুগে নানান জাতির ও ধর্মচিন্তার ইতিহাসটি ধারা-বাহিকভাবে ধরা যায়। একেবারে গোড়ায় পারস্যের আদিমতম অধিবাসীরা বসতি-স্থানের তলায় লাল রঙে রাঙানো মৃতদেহ পাথরের অস্ত্র ও ভেড়ার হাড়ের সঙ্গে রাখতেন। ক্রমে প্রাচীন ইরানীয় জাতি পারস্যে প্রবেশ করে বসতি-স্থানের কিছু দূরে রুপোর কারুকার্য-খচিত চামড়ার শিরস্ত্রাণ, লোহা ও তামার জিনিসপত্র, জন্তুজানোয়ারের মূর্তিওয়ালা কাঁটা এবং ঘোড়ার সাজ-পোশাক-সমেত মৃতদেহ সমাধি দেওয়ার প্রথার প্রবর্তন করেন। পারস্যের প্রাচীন রাজারা পাহাড়ের গায়ে সুন্দর সুন্দর সমাধিগৃহের ব্যবহার করতেন। এই সমাধিগুলির গঠন ও শিল্পভঙ্গিমার সাহায্যে পশ্চিম-

এশিয়ার দেশগুলি এবং গ্রীস দেশের সঙ্গে পারস্যের যোগাযোগের কথা বুঝতে পারা যায়। ক্রমে জরথুস্ত্রীয় ধর্মের প্রভাবে স্তব্ধতার স্তম্ভশিখরে মৃতদেহ ফেলে রাখবার পর হাড়গুলি এক যৌথ সমাধি-গৃহে নিক্ষেপ করার প্রথার প্রচলন হয়।

প্রাচীন কালের বহু দূর দূর দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কথাও জানা যায় সমাধি থেকে। সোবিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত সাইবেরিয়ার আল্‌তাই অঞ্চল সব সময়ে বরফে ঢাকা থাকে। সেইজন্যে এই অঞ্চলে সমাধিগৃহে উল্কি-আঁকা মৃতদেহ ও তার সঙ্গে ঘোড়া, যুদ্ধ-রথ, সুন্দর-কাজ-করা কার্পেট, এ সমস্তই তাজা অবস্থায় পাওয়া গেছে। প্রমাণিত হয়েছে যে, উত্তর-এশিয়ার যাযাবর জাতিগোষ্ঠী একদিকে চীন, অন্যদিকে ভূমধ্যসাগর ও পশ্চিম-এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিল।

ইউরোপের নানা অংশে, ব্রিটেন, আয়ারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতিতে এক ধরনের মস্ত বড় পাথরের চাঁই মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এইগুলিকে মহা-প্রস্তরীয় সমাধি বলেন। এই সমাধিতে ব্যবহৃত পাথরগুলি দেখলেই



অসেবর্গের ভাইকিং রানীর নৌকো-সমাধি: নরওয়ে

বোঝা যায় যে এগুলি বহু লোকের দ্বারা বহু দিন ধরে খাটাখাটনির ফলে তৈরি হয়েছে। কোন-কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, পূর্ব-ভূমধ্য-সাগরের মিশর প্রভৃতি দেশ থেকে এসে ধর্মপ্রচারকরা ইউরোপের অনগ্রসর জাতিগুলির মধ্যে এই ধরনের সমাধির প্রচলন করেন।

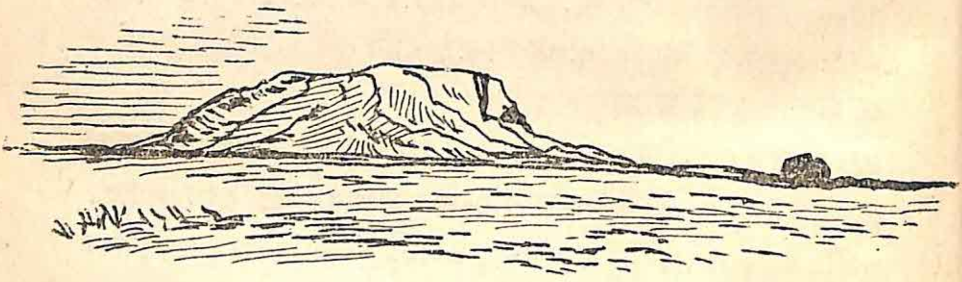
পৃথিবীর অনেক অজানা সভ্যতার কথা কেবলমাত্র সমাধির মাধ্যমেই আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে। ইতালির অতি প্রাচীন এত্রুস্কান জাতির সংস্কৃতির খবরের প্রায় সবটাই এসেছে তাদের সমাধি থেকে। প্রায় হাজার বছরেরও সামান্য আগে ভাইকিং নামে এক ধরনের অসমসাহসী সমুদ্র-অভিযানকারী গোষ্ঠী ডেনমার্ক, সুইডেন ও নরওয়ের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পশ্চিম ইউরোপের দেশ-গুলিতে, ফিনল্যাণ্ডে ও রুশ দেশে যুদ্ধবিগ্রহ করে বেড়াত। সপ্তম শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের 'সাটন হু' নৌকো-সমাধি এবং নরওয়ের 'অসেবর্গ' নৌকো-সমাধি থেকে আমরা এদের জীবন-যাত্রার পরিচয় লাভ করি। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন জাতিদের কথাও আমরা প্রধানত তাদের সমাধি থেকেই জানতে পারি।

প্রাচীন কালের ভারতে সমাধি

ভারতবর্ষেও প্রাচীন কালে নানান ধরনের সমাধি দেবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এইগুলির মধ্যে সিন্ধু-সভ্যতার কেন্দ্র হরপ্পা নগরের দুর্গটির উত্তর-পশ্চিমের সাধারণ নাগরিকদের সমাধিক্ষেত্রটি উল্লেখযোগ্য ও সর্বপ্রাচীন। এর মধ্যে মৃতদেহের সঙ্গে বহু মৃৎপাত্র, শাঁখা, হার, মল, এক ধরনের নরম পাথরের কাজ-করা পুঁতি, তামার আংটি, দুল, ব্রোঞ্জের পালিশ-করা আয়না, কাদামাটির প্রদীপ প্রভৃতি পাওয়া গেছে। সমাধিগুলিতে মৃতদেহের মাথা উত্তরে রেখে দেহকে উত্তর-দক্ষিণে শুইয়ে দেওয়া হত। এর মধ্যে কেবল দুটি সমাধিতে কাদামাটির ইটের ও কাঠের শবাধারের চিহ্ন পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা দ্বিতীয় ধরনের শবাধারটি মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন ধরনের সমাধির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

সিন্ধু-সভ্যতার আর একটি কেন্দ্র লোথাল গুজরাটে অবস্থিত। এখানেও সমাধি-ক্ষেত্রটি শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে। এ ক্ষেত্রেও মৃতদেহের মাথা উত্তরে ও পা দক্ষিণে রেখে শয়ন করানো হয়েছে। এখানকার দুটো সমাধিতে জোড়া কঙ্কালের অস্তিত্ব দেখা যায়। হরপ্পাতে অনেক পরের যুগের এক ধরনের সমাধিতে মৃতদেহ হাঁটুর কাছে বেঁকিয়ে রাখা হয়েছে। দেহের বিচ্ছিন্ন হাড়গোড়কে বড়-বড় মাটির পাত্রের মধ্যে রেখে ও হাঁটু মুড়ে বসিয়ে মৃৎপাত্রের মধ্যে শিশুদের সমাধি দেওয়ার রীতিও এখানে দেখা যায়। সমাধি দান পদ্ধতির এইসকল পরিবর্তন, সমাধির সঙ্গে মৃৎপাত্রের বিশেষ ধরনের নক্সা প্রভৃতি এক নতুন জাতির কথা জানিয়ে দেয়। সম্ভবত এ জাতি পরবর্তীকালে সিন্ধু উপত্যকায় এসে থাকবে।

সিন্ধু-সভ্যতার শেষ দিক থেকে বহু শত বছর পর্যন্ত ভারতের নানা জায়গায় তাম্র-প্রস্তর যুগের বহু গ্রামের পরিচয় পাওয়া



প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষের ফলে তৈরি ঢিবি

যায়। এ-সব জায়গার অধিবাসীরা কৃষিকার্য করেই জীবন ধারণ করত। এর মধ্যে দক্ষিণ ভারতের নেভাসায় ও পশ্চিম বঙ্গের পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাচীন সমাধির সন্ধান পাওয়া গেছে। এক বা একাধিক মাটির পাত্রের মধ্যে দেহ সমাধিস্থ করার রীতি নেভা-সায় দেখা গেছে। পূর্ব পশ্চিমে শুইয়ে মৃতদেহের সমাধি দেওয়া এবং মাটির পাত্রে সমাধি দেওয়ার পদ্ধতি পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে দেখা যায়।

ভারতের দক্ষিণ দেশে, যেমন—অন্ধ্র, মহীশূর, মাদ্রাজ, কেরলে

প্রচুর মহাপ্রস্তরীয় সমাধি রয়েছে। এইগুলিতে অনেক সময় পাথরের ফলক দিয়ে তৈরি একদিকে-গর্তওয়ালা বাক্সের মত সমাধি-গৃহে মানুষের দেহ-কঙ্কাল রক্ষা করা হত। অনেক সময়ে মাটির তৈরি শবাধারও ব্যবহার করা হত। শবাধারগুলির আকারও ছিল অদ্ভুত। এই সমাধি-ধারা বোধ হয় খ্রীস্টীয় শতাব্দীর কয়েকশো বছর পূর্বে ও পরে প্রচলিত ছিল। অনেকে এইগুলিকে দ্রাবিড় সভ্যতার নিদর্শন বলে মনে করেন। এ জাতি লোহার ব্যবহার, চাষবাসের কাজ এবং ধানচালের ব্যবহার জানত। তাছাড়া এরা ছিল কৃত্রিম জলসেচের কাজে বিশেষ পারদর্শী।

আমরা এতক্ষণ যা বললাম তার মধ্য দিয়ে প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে সমাধির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। তাই প্রাচীন সমাধি খনন করার কাজ খুব সাবধানে করতে হয়। কোন কিছুরই কথা অসাবধানে ভুলে গেলে চলে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের কঙ্কালের গড়ন দেখে পণ্ডিতেরা বহুকাল আগের একটি মানুষের বয়স, জাতিগোষ্ঠী, স্ত্রীলোক অথবা পুরুষ এ-সব খবর সরবরাহ করতে পারেন। নানা ধরনের রোগের ফলে মানুষের দেহের হাড় বিকৃত হয়ে যায়, সুতরাং হাড়ের বিকৃতি দেখে মানুষটি কোন্ রোগে ভুগে মারা গেছে এবং তার দেহের গঠনে কোন ত্রুটি ছিল কি না—এ সমস্ত কথাও অনেক ক্ষেত্রেই নিঃসন্দেহে বলা যায়। মিশরের অনেক সমাধিতে পাওয়া হাড় প্রভৃতি থেকে প্রাচীন মিশরীয়দের রোগের বিবরণ জানা যায়। যুদ্ধ-বিগ্রহে মৃত্যু হলে হাড়ে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন থাকে। এর সাহায্যে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক নিশ্চিত ধারণা করতে পারেন। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত 'মোডন ক্যাস্‌ল্'-এর একটি সমাধিতে মৃতদেহের শিরদাঁড়ার মধ্যে সৈন্যের বর্শা-ফলক দেখতে পাওয়া যায়। এর ফলে আমরা স্থানীয় স্যাক্সন অধি-বাসীদের সঙ্গে রোম্যান সৈন্যদের যুদ্ধের কথা খানিকটা বুঝতে পারি।

শবাধারও সমাধিতে পাওয়া মৃতাদেহাবশেষেরই মত দরকারি।

অনেক সময়ে ঘরবাড়ির মত করে শবাধার তৈরি করা হত। মিশরের শবাধারগুলির বাইরের দিকটা মৃত রাজা বা রাজপুরুষের মুখাবয়ব ও সাজ-পোশাকের মত রঙ করে রাখা হত। অনেক সময়ে শবাধারের কাঠ মাটির তলায় থেকে থেকে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেত। প্রাচীন হরপ্পা নগর থেকে পায়ের দিকটা সরু ও মাথার দিকটা চওড়া একটি কাঠের শবাধারের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। পচা কাঠের কালো দাগ মাটিতে পাওয়া গেছে বলে এ-ক্ষেত্রে শবাধারটিকে চিনে নেওয়া শক্ত হয় নি। বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষা করে বলেছেন, এ শবাধারটি তৈরি করা হয়েছিল দেবদারু কাঠ দিয়ে। এ থেকে সিন্ধু-নদের অধিবাসীদের সঙ্গে উত্তর ভারতের হিমালয়ের জানুদেশে দেবদারু গাছের অঞ্চলের সঙ্গে একটা যোগযোগের কথা জানতে পারা যায়।

সমাধি খনন করার জন্যে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। এমনকি সমাধিতে থাকা পশুপক্ষীর বিচারও খুব সতর্ক-ভাবে করতে হয়। নরওয়ের অসেবর্গ ভাইকিং রানীর সমাধিতে পাওয়া গৃহপালিত পশুর আংশিক তাজা পাকস্থলীর বিচারে জানা গেছে যে, ঐ জন্তুটি সমাধিস্থ হবার ঠিক আগেই নতুন ঘাস পাতা খেয়েছিল। ঐ সমাধিটি যে নতুন গাছপালা জন্মাবার সময়ে অর্থাৎ গ্রীষ্ম বা বসন্তকালে তৈরি করা হয়েছিল এ হল তার একটি প্রমাণ। অবশ্য এ মতের সপক্ষে আরও অনেক প্রমাণ আছে।

প্রাচীন সমাধিতে অনুসন্ধান চালাতে গেলে আরও বহু ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়। সমাধির সময়ে যে-সব সমাধিতে অত্যন্ত দামি বহু জিনিসপত্র থাকত সে-সব সমাধি বা স্মৃতিসৌধের প্রবেশপথটি জানতে দেওয়া হত না; তা লুকিয়ে রাখা হত এমনভাবে যাতে সেটি সহজে খুঁজে পাওয়া না যায়। সমাধি খোঁড়বার সময়ে যে কর্মকৌশল ও পদ্ধতি প্রত্নতাত্ত্বিকেরা গ্রহণ করে থাকেন সে সম্বন্ধে খানিকটা আভাস আমরা স্তর-বিন্যাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্যের অধ্যায়ে বলবার চেষ্টা করব।

৬

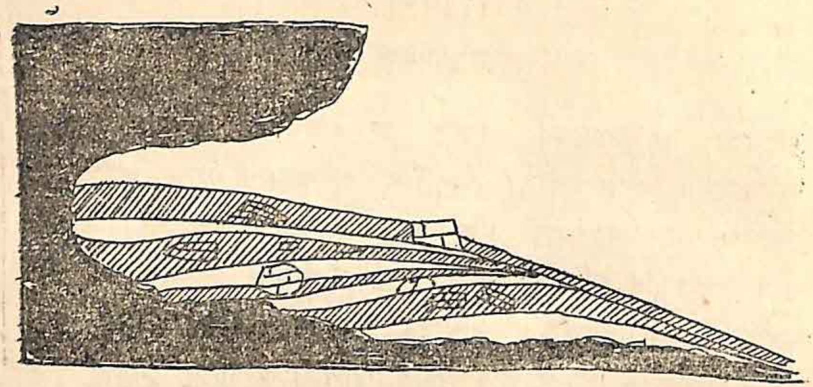
বাসস্থানের কথা

মানুষের বসতিস্থানের প্রকৃতি বহু ধরনের। কোথাও মানুষ বাসস্থানের জন্যে ভূপৃষ্ঠের নৈসর্গিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়েছে, কোথাও বা আপনার বুদ্ধি বা কর্মক্ষমতা অনুসারে ভূপৃষ্ঠের স্বাভাবিকতাকে পরিবর্তন করে নিয়ে আপনার জীবনযাত্রার পক্ষে উপযুক্ত করে নিয়েছে। মানুষের সভ্যতার বিভিন্ন যুগের গুহা-কন্দর, কুটির ও ইট-পাথরে তৈরি স্থাপত্যকে চিনে নেবার চেষ্টা করতে হয় অনুসন্ধানকারীকে।

বাসস্থান হিসেবে গুহা

আমরা আগেই জেনেছি যে একেবারে আদিম যুগে মানুষ পাহাড়ের গুহাকন্দরে বাস করত। পাহাড়ের গুহাগুলি আমরা যত সহজে অনুসন্ধান করার উপযুক্ত মনে করে থাকি মোটেই কিন্তু তা নয়। পাহাড়ের গুহায় অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের প্রথমেই গুহামুখটির কাছাকাছি জায়গায়ই খুব সতর্কতা ও দূরদৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পাহাড়ের খাড়াই গা বেয়ে বৃষ্টি বা তুষার-গলা জল গুহামুখের উপরদিককার দেওয়ালের ঠিক তলায় পড়ে পড়ে একটা নালীর মত খাতের সৃষ্টি করে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই অগভীর খাতের নাম দিয়েছেন 'ড্রিপ লাইন' বা 'ফোঁটা জলের দাগ'। গুহার বাইরে থেকে ধুলোবালির স্রোত গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ে। তাছাড়া গুহার ছাদ ও পাশের দেওয়াল থেকে পাথর মাটি ঝরে পড়ে ভূমিতলকে উঁচু করে দেয়। গুহার ধরন-ধারণ দেখে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা 'বাইরের গুহা' ও 'ভিতরের গুহা' এই দুই প্রকারের প্রাগৈতিহাসিক বাসস্থানের পরিচয় পেয়েছেন। বাইরের গুহাগুলির

সৃষ্টি হয় বহুদিন আগের জলের স্রোতের আঘাত পেয়ে নরম পাথরের স্তর ক্ষয়ে যাওয়ার ফলে। সামুদ্রিক লোনা বাতাসের



পার্বত্য গুহার স্তরবিন্যাস ঃ [illegible]

সংস্পর্শে এসে অনেক পাহাড়ের গা ক্ষয়ে এইরকম গুহার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে পাহাড়ের ভিতরের গুহাগুলির সৃষ্টি হয়েছে মাটির তলাকার জলস্রোতের প্রভাবে বা ভূকম্পনের ফলে পাথরের স্তরের চিড়-খাওয়া ফাঁক ক্রমশ বড় হয়ে গিয়ে। প্রাচীন কালের মানুষেরা গুহাতে হয়ত আগুন জ্বেলেছিল। পাথরের তৈরি নানান রকমের অস্ত্রশস্ত্র এবং খাওয়ার শেষে হাড়গোড় ফেলে গুহা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তার অনেক দিন পর অন্য একদল মানুষ হয়ত আবার গুহাটি ব্যবহার করতে লাগল। তারাও জীবনযাত্রার আরও অন্য ধরনের জিনিসপত্র ফেলে গেল। এখন, এই দুটি স্তরের মধ্যকার স্তরটিতে প্রাকৃতিক-প্রভাবে-জমে-ওঠা মাটিতে মানুষের বাস করার কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না। ফরাসী দেশ ও স্পেনের অনেক গুহাতেই এইরকম মানুষের বাস করার চিহ্নহীন স্তর এবং চিহ্নিত স্তর পর-পর সাজানো অবস্থায় দেখা গেছে। তবে গুহার মধ্যে খনন করতে গেলে আমাদের সতর্ক হতে হবে। কারণ অনেক সময়ে গুহাগুলি প্রাচীনকালের হিংস্র শ্বাপদ ও বৃহদাকার গুহা-

ভালুকের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল। এ-ক্ষেত্রে জন্তু-জানোয়ারের হাড়গোড় খুঁড়ে বার হলেই সেগুলিকে মানুষের নিয়ে আসা বলে মনে করা চলে না। মাংসাশী প্রাণীরা অনেক সময়েই শিকার-করা জন্তু গুহার মধ্যে নিশ্চিন্তে বহন করে নিয়ে আসে। ভালুকেরা শীতকালে গুহার ভিতরের দিকেই বাচ্চা-কাচ্চা সমেত আশ্রয় নিত। কাজেই গুহার মধ্যে ইতস্তত ভালুকের হাড় পাওয়াও কিছু আশ্চর্য নয়। গুহার ভিতরদিকের দেওয়ালে যে সমস্ত চিত্র দেখা যায় অনুসন্ধানকারীদের সেগুলিও খুঁটিয়ে দেখতে হয়। ভাল করে দেখলে বোঝা যায় পুরাতন ছবির উপর নতুন ছবি আঁকা হয়েছে। প্রাচীন প্রস্তর-যুগের শেষের দিক থেকে গুহার মধ্যে সমাধিদান-রীতিরও প্রচলন হয়েছিল।

খোলা জায়গায় বাসস্থান

প্রস্তর-যুগের শেষ দিকে খোলা জায়গাতেও মানুষ বসবাস করতে থাকে। এইরকম ধরনের বাসস্থান খুঁজে বার করা একটু শক্ত। মাটির উপরে ডালপালা, বড় বড় হাড় আর চামড়ার আচ্ছাদন দিয়েও এক ধরনের থাকবার জায়গা তৈরি করা হত। এই ধরনের বাসস্থান রুশদেশের সমতল ভূমিতে দেখতে পাওয়া গেছে। মানুষ বাস করার ফলে বাসস্থানের মাটি অন্যান্য জায়গার মাটির থেকে অপেক্ষাকৃত ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে ওঠে। শীতের দেশে বোধহয় এ-ধরনের খোলা জায়গায় বাসস্থানগুলি ব্যবহার করা হত। রাশিয়ার স্তেপভূমিতে ম্যামথের হাড় দিয়ে ঠেকা-দেওয়া তাঁবুর আকারের বাসস্থানের চিহ্ন পাওয়া গেছে। মাটির তলায় খানিকটা খুঁড়ে নিয়ে উপরদিকটা কাঠের গুড়ির উপর মাটি চাপিয়ে তৈরি এক ধরনের প্রস্তরযুগীয় বাসস্থানও রুশীয় স্তেপভূমির কোন-কোন জায়গায় দেখা যায়। মাটির তলায় বাস করার চিহ্ন অন্যান্য দেশেও প্রচুর আছে। ভারতের কাশ্মীরের একটি স্থানেও নব্য-প্রস্তরযুগের এ-ধরনের বাসস্থান সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাসস্থান হিসেবে কুটির

মানুষের সভ্যতা আরও অগ্রসর হবার পর রীতিমত ভালভাবে তৈরি কুটিরের আবির্ভাব হয়েছিল। কুটিরের অবস্থান বুঝতে হলে প্রথমেই মাটিতে এর প্রধান-প্রধান খুঁটিগুলির অনুসন্ধান করতে হবে। একটা কুটিরের বৃত্তাকার খুঁটির গর্তগুলির দাগ থেকে কুটিরের বিভিন্ন অংশের গঠন-পরিকল্পনাটি পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। কুটিরের মেঝে পাথর দিয়ে বাঁধানো হলে তো কথাই নেই। এমনকি কুটিরের উনুন জ্বালাবার স্থানটির সাজানো রূপটি থেকেও কুটিরবাসীদের কাল নির্ণয় করা চলতে পারে। ভারতের নানা অংশের তাম্র-প্রস্তরীয় সংস্কৃতি-কেন্দ্রে এই ধরনের খুঁটির অবস্থান দেখে কুটিরের আকার নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। ইউরোপে জলা ও হ্রদ অঞ্চলে জলের উপর তৈরি কুটিরগুলিতে কাঠের উপর মাটির মেঝে থাকত। আর্দ্রতা থেকে এ ধরনের মেঝে রক্ষা করবার জন্যে এগুলিতে একাধিকবার বার্চ গাছের বাকলের আস্তরণ দেওয়া হয়েছিল।

ইটের তৈরি পাকা বাড়ি

পৃথিবীর খুব পুরোনো ও অপেক্ষাকৃত শুকনো জায়গায় কেবলমাত্র কাদামাটির সঙ্গে খড় মিশিয়ে দেওয়াল গড়ে তোলার রেওয়াজ ছিল। বহু যুগ গত হবার পর এই ধরনের ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ চিনে ওঠা শক্ত। গড়বার কাজে সুবিধের জন্যে মানুষ ক্রমে ইটের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। প্রাচীন কালে দুই রকমের ইটের প্রচলন ছিল। মাটির ইটকে কেবলমাত্র রোদে শুকিয়ে নিয়ে এক ধরনের ইট তৈরি করা হত। এই ইটের ব্যবহারের ফলে পরিশ্রম তো কমেই ছিল, উপরন্তু মরুভূমির মত দেশে মূল্যবান জ্বালানি কাঠ ইট পোড়াবার কাজে না লাগিয়ে অন্য কাজে ব্যবহার করা যেত। প্রাচীন পশ্চিম-এশিয়ার বহু ঘরবাড়ি ও দেবতাদের মন্দিরে

এই ধরনের রোদে শুকোনো ইটের ব্যবহার দেখা যায়। ভারতের সিন্ধু-সভ্যতার নগরগুলিতে রোদে শুকোনো ইটের দেওয়াল পাওয়া গেছে। পোড়ানো ইটের ব্যবহারের ফলে ঘরবাড়ি অনেক শক্ত ও পাকাপোক্ত হয়। মেসোপটেমিয়ার প্রাচীনতম ইটের গড়ন টালির মত পাতলা। কিন্তু এর পরে একদিকে উঁচু অন্যদিকে সমতল এক ধরনের ইটও এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

ইট সাজানোর প্রকার-ভেদ থেকেও বিভিন্ন যুগের বাস্তুরীতির পরিচয় পাওয়া সম্ভব। ইটগুলি আড়াআড়ি বা লম্বালম্বিভাবে বসিয়ে দেওয়াল গাঁথা চলে। কখনো বা ইটগুলি এমনভাবে বসানো হয় যে, দেখতে হয় অনেকটা মাছের কাঁটার মত। ইটের গাঁথনি ভাল করে লক্ষ্য করলে যদি দেখা যায় যে কোন এক জায়গায় উপর থেকে নিচে ইটের জোড়ার দাগ সব স্তরেই একই রেখায় পর-পর সাজানো আছে তাহলে বুঝতে হবে যে, সে জায়গায় আগে কোন দেওয়াল ছিল না, কেবলমাত্র ইটের গাঁথনি দিয়েই খোলা জায়গাটিকে ভরাট করা হয়েছে। কখনো-কখনো কাঁচা অবস্থায় ইটের গায়ে শস্যের দানার ছাপ আঁকা হয়ে যায়। তা-ছাড়া ইটের গায়ে প্রাচীন কালের নানাপ্রকার লেখ বা লিপি থাকতে পারে। এনামেল করে কখনো-কখনো ইটের চেহারা সুন্দর করা হয়। এ-সব কারণের জন্যে প্রত্নতাত্ত্বিককে পুরোনো যুগের ইটগুলিকে বেশ খুঁটিয়ে দেখবার অভ্যেস রাখতে হয়।

ইটের গাঁথনিতে দেবার জন্যে পৃথিবীর নানা দেশে ও নানা যুগে অনেক রকমের মশলা ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু কাদামাটি চুন ও কাদামাটি, চকমাটি ও কাদা, এমন কি বিটুমেনের ব্যবহার এর মধ্যে প্রধান। পরবর্তীকালে চুন-সুরকি প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। মহেনজোদাড়োর বিখ্যাত স্নানাগারের চৌবাচ্চাটিকে নিশ্চিদ্র করার জন্যে বিটুমেন ব্যবহার করা হয়েছিল।

প্রাচীন কালে পোড়ানো বা রোদে শুকোনো ইটের ব্যবহারে

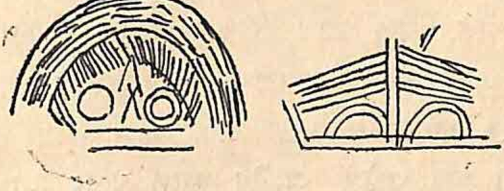
ভারতের সিন্ধু-সভ্যতার অধিবাসীরা বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। মস্ত বড়-বড় ঘরবাড়ি, প্রাসাদ এবং নগর-প্রাকার নির্মাণে মহেনজোদাড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি শহরে অতি সুন্দরভাবে জোড়-দেওয়া ইটের গাঁথনি দেখতে পাওয়া যায়। পোড়ানো ইটের ব্যবহার দেখে বন্যার প্রকোপ বা জলজ আবহাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে।

পাথরের তৈরি ঘরবাড়ি

ইটের মত প্রাচীন কালের বাড়িঘর তৈরির অন্যতম উপাদান হল পাথর। একেবারে প্রাচীন কালে কেবল এবড়ো-খেবড়ো পাথর পর-পর সাজিয়ে নিয়ে দেয়াল তৈরি হত। পাথরগুলি যদি স্বাভাবিক অবস্থাতেই আড়াআড়িভাবে ভাঙা এবং মসৃণ অবস্থায় পাওয়া যায় তাহলে তো কথাই নেই। ব্রিটিশ দ্বীপ-পুঞ্জের কোন-কোন নব্য-প্রস্তরীয় অঞ্চলে এ ধরনের ঘরবাড়ি দেখা যায়। ক্রীট দ্বীপে, প্রাচীন হিটাইটদের শহর হাত্তুসাসে ও ভারতবর্ষের রাজগীরে বড় বড় পাথর পর-পর সাজিয়ে নগর-প্রাকার তৈরি করার প্রথা ছিল। ভারতের মধ্যযুগীয় বহু মন্দির কেবলমাত্র সুন্দরভাবে কাটা নানা আকারের পাথরের পরস্পর-নির্ভর ও সুন্দর ভারসাম্যের সাহায্যেই আজও দাঁড়িয়ে আছে।

নগর-সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পাথরের কদরও ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকে। পাথরের গাঁথনিতে মাল-মশলার ব্যবহারও শুরু হয় এই সময়ে। রাজা ও ধনীদের প্রাসাদ ও বহু মন্দির বানানোর জন্যে বহুদূর দেশ থেকে নিয়ে-আসা পাথর কাজে লাগানো হয়। অনেক স্থলেই পাথরের গায়ে খোদাই করে পুরা-কালের কাঠ ও নলখাগড়া দিয়ে তৈরি ঘরবাড়ির নকল করা হতে থাকে। প্রাচীন মিশর দেশের পাথরের প্রাসাদে প্যাপিরাস্ (নীল নদীর তীরে নলজাতীয় উদ্ভিদ) গুচ্ছের মত স্তম্ভের সারি দেখতে

পাওয়া যায়। ভারতের অজন্তা প্রভৃতি গুহায় রয়েছে গরুর গাড়ির ছইয়ের মত বাঁকানো ছাদ ও সামনের দিকে বিচিত্র



প্রাচীন গুহাচিত্রে প্রস্তর-যুগীয় আবাস-স্থল

গঠনের গবাক্ষ। সাঁচী ও অন্যান্য বৌদ্ধস্তূপের চারদিকে রয়েছে পাথরের প্রাচীর। এ-সব দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, এতে পুরাতন কালের কাঠের ঘরবাড়ির নকল করা হয়েছে। কাজে-কাজেই পাথরের ঘরবাড়ির সাহায্যে একটি প্রাচীন সভ্যতার যোগাযোগ, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সময়ের আগের ঘরবাড়ির আকার ও প্রকৃতি সম্পর্কেও একটা ধারণা করে নেওয়া সম্ভব হয় এ থেকে।

প্রাচীন সৌধে ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের রেওয়াজও কিছু আধুনিক নয়। প্রাচীন ব্যাবিলনের শেষ রাজা নাবোনিদাস মেসোপটেমিয়ার সিপ্‌-পার শহরে সূর্যদেব 'শামাশ'-এর মন্দিরের চত্বরের ভিতরে খননের ফলে তাঁর রাজত্বকালের বহু পূর্বের শাসক আক্কাদীয় রাজা সারগনের পুত্র নারামসিনের সময়ে প্রোথিত একটি লিখিত ভিত্তি-প্রস্তর দেখতে পান।

ঘরবাড়ির দরজা ও চৌকাঠ

ঘরবাড়ি তৈরির ব্যাপারে দরজা বা চৌকাঠের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। অনেক সময়ে প্রাচীন কালের ঘরবাড়ির দরজার চৌকাঠ পাথরের তৈরি ছিল। কাজেই চৌকাঠের কোনও জায়গায় দরজা আটকাবার জন্যে কব্জায় গর্ত করা থাকত। এ-সব গর্ত দেখে দরজার অবস্থান বুঝতে পারা যায়। পাথরের দেয়াল শক্ত ও স্থায়ীভাবে তৈরি করা হলে তা বহুদিন ধরে দাঁড়িয়ে

থাকে। এ-রকম অবস্থায় ভূমিকম্প বা বিদেশী শত্রুর আক্রমণে নগর ধ্বংস হবার পরও পুরোনো দিনের ঘরে নতুন অধিবাসীরা এসে বাস করতে থাকে। এতে আপাতদৃষ্টিতে খুব পরিবর্তন হয় না বটে, কিন্তু ঘরের মেঝেটি আর একটু উপরে উঠে যায়। এইরকম একাধিকবার-উঁচু-হওয়া মেঝের জন্যে দরজার চৌকাঠকেও উঁচু করতে হয়। এর ফলে ঘরের স্তর-বিন্যাস বোঝার কাজটি সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। প্রাচীন কালে ঘরের নিচে ভাঁড়ার তৈরি করা হত। আংশিকভাবে বা পুরোপুরিভাবে মাটির নিচেকার এই ভাঁড়ার-ঘরগুলি মাটির উপরকার ঘরবাড়িরই সমসাময়িক।

পুরাকালের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট প্রাচীন শহর চিনিয়ে দেয়

অনেক ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, প্রাসাদ ও মন্দির নিয়েই এক-একটি শহর গড়ে ওঠে। সব মিলিয়ে একটি শহরের পরিচয় পেতে গেলে বিভিন্ন রকমের ঘরবাড়ির অবস্থান লক্ষ্য করতে হবে। প্রাচীন কালের শহরের কেন্দ্রস্থলেই ছিল মন্দির ও রাজপ্রাসাদ। শহরের সাধারণ ঘরবাড়ির আয়তনের সঙ্গে রাজবাড়ি বা প্রাসাদের আয়তনের তুলনা করে দেখলেই তার অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানতে পারা যায়। তবে এ ব্যাপারে ঘরবাড়ি তৈরির উপাদানও লক্ষ্য করবার মত। সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি ও কুটিরের দেয়ালে গাছ-গাছড়া বা বাঁশের বুননের উপর মাটি চাপানো হত। সেইসময়কারই রাজবাড়ি বা মন্দিরের দেয়ালে থাকত পাথর ও সুন্দর অলঙ্কারের কারুকার্য। তা-ছাড়া শহরের রাস্তাঘাট দেখেও তার উন্নতি-অবনতির কথা জানতে পারা যায়। সিন্ধু সভ্যতার যখন শীর্ষ সময় তখন সিন্ধুবাসীরা শহরের শাসকদের কঠিন ও সুসংবদ্ধ আইন কানুন মেনে চলতেন বলে জানা গেছে। রাস্তাগুলো সরল এবং সোজাভাবে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হত। বাড়িঘরের গাঁথনিও ছিল চমৎকার। পরবর্তীকালে দেখা

যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার নাগরিকেরা আর সুষ্ঠুভাবে আইন কানুন মেনে চলছেন না। রাস্তার দু-পাশের ঘরবাড়ি অনেক সময়েই একটু একটু রাস্তার উপরে এগিয়ে এসেছে। শহরের অতি সুন্দর পয়ঃপ্রণালীতে সংস্কারের অভাবে ভাঙন ধরেছে। নগরের ঘরবাড়ির গাঁথনি ও গঠনেও এসেছে অবনতির লক্ষণ। নগর-প্রাকার প্রাচীন কালের শহরগুলির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। একটি প্রাচীন শহর ও নগর-প্রাকারের অবস্থান ও তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রকৃতি দেখে শহরটির উন্নতি অবনতির কথা বুঝে নেওয়া সম্ভব। ভারতের হরপ্পা, কৌশাম্বী, শিশুপালগড় প্রভৃতি স্থানে বিরাট বিরাট নগর-প্রাকার প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খুঁড়ে বার করেছেন। হরপ্পা দুর্গের বহুখ্যাত প্রাকারটিতে বিভিন্ন সময়ের সংস্কার-কার্যের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়।

কোথাও যদি পুরোনো দিনের ঘরবাড়ি থেকে ইট, পাথর প্রভৃতি নিয়ে নিয়ে পরবর্তীকালের লোকেরা নিজেদের ঘরবাড়ি তৈরি করতে থাকে তাহলে এক সময়ে প্রাচীন কালের সৌধের চিহ্ন প্রায় পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এ-রকম অবস্থায়ও প্রত্ন-অনুসন্ধানী হাল ছেড়ে দেন না। পুরোনো আমলের দেয়াল যদি খানিকটা মাটির মধ্যে ভিতের গর্ত করার খাতের প্রাথমিক গাঁথনি থেকে শুরু হয় তাহলে তার চিহ্ন সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয় না।

আশেপাশে চাপ মাটি এবং মাঝখানকার ভিতের যে খাত তার আলগা ঝুরো মাটি দেয়াল ও তার আনুষঙ্গিক ভিত্তি-সংস্থানকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে।

৭

খননের কথা

মাটির উপরে কয়েকটি চিহ্ন দেখে বা অতি-পুরাতন লোক-কথা বা কিম্বদন্তীর পর্যালোচনা করে কী করে প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান পেতে হয় সে কথা আমরা আগেই বলেছি। এবারে কর্মকৌশল নিয়ে কয়েকটি কথা বলা যাক।

কী জাতীয় সাজসরঞ্জাম সঙ্গে নিতে হবে

কোন স্থানে খননের কাজ চালাবার আগে খননকারীকে নানারকম জিনিসপত্র, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হয়। প্রথমেই ব্যবস্থা করতে হয় খোলা জায়গায় থাকবার উপযুক্ত তাঁবু, ক্যাম্প-খাট, টেবিল-চেয়ার, রান্নার ও খাবার সরঞ্জাম প্রভৃতির। অভিযান চালাবার আগেই এগুলির ব্যবস্থা না করলে অনেক সময়ে আসল কাজ অনেক পিছিয়ে পড়ে। সাজ-সরঞ্জামের একটা অংশ লাগে সরাসরি মাটি খোঁড়বার কাজে। ছোট হাত-কোদাল, ছোট ও বড় গাঁইতি, শাবল, খুরপি, বড় ছুরি, লোম ও তারের বুরুশ, ছোট তুলি, কাঁটা, ঝুড়ি, বালতি প্রভৃতি এই অংশের সরঞ্জামের মধ্যে পড়ে। মাটির তলায় জল উঠলে তা তাড়াতাড়ি তুলে ফেলে দেবার জন্যে ছোট হাত-পাম্প বা বৈদ্যুতিক শক্তি-চালিত পাম্পও অনেকে ব্যবহার করে থাকেন। পরিমাপক যন্ত্রেরও একটা বিশেষ স্থান রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের কাজে। জমি মাপবার জন্যে বড় ফিতের দরকার। অন্যান্য জিনিস ও পরিখা বা খোঁড়া খাদের মধ্যে মাপ-জোখ করার জন্যে ইস্পাতের বা সাধারণ ছোট ফিতে, ওলন-দড়ি, লেভেল-মাপক যন্ত্র, সাধারণ ছোট স্কেল প্রভৃতিও দরকার। জরিপের কাজে লাগবার

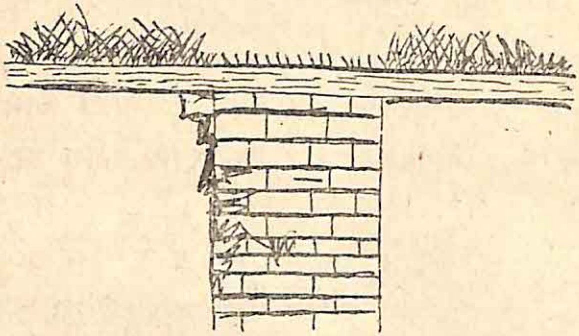
মত সাদা-কালো-দাগওয়ালা খুঁটি এবং জমির উঁচু-নিচু ভাব সঠিক-ভাবে এঁকে নেওয়ার জন্যে নানা প্রকারের যন্ত্র, প্লেন টেবিল, কম্পাস, রুলার প্রভৃতিরও প্রয়োজন। এ ছাড়া অঙ্কনের জন্যে উপযুক্ত ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স, গ্রাফ কাগজ, মোটা সাদা কাগজ, খাতা প্রভৃতিও বাদ দিলে চলবে না। ফোটো তোলার জন্যে ভাল ক্যামেরা, তার আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম ও রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবস্থা থাকাও অত্যন্ত দরকার।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের কাজে সাধারণত তিন শ্রেণীর কর্মীর প্রয়োজন হয়। প্রথমেই অভিজ্ঞ পরিচালকদের কথা বলতে পারি। এঁদের উপরেই খননের কাজ পরিচালনা করার প্রধানতম দায়িত্ব থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মীরা সাধারণত প্রত্নাঞ্চলের একটি খাদ বা পরিখার খননকার্য পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করার দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। ফোটোগ্রাফার এবং ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানরা এই শ্রেণীর কর্মীরই অনুরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে থাকেন। তৃতীয় রকমের কর্মী হলেন খননকারী শ্রমিকেরা। খননকার্যের সামগ্রিক সাফল্য অনেকটাই এঁদের উপর নির্ভর করে, কারণ খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও গভীর অভিনিবেশ সহকারে কাজ না করলে খোঁড়বার সময়েই অনেক জিনিস খনক অস্ত্রের আঘাতে বিনষ্ট হবার আশঙ্কা থেকে যায়। তা-ছাড়া অমূল্য প্রত্ন-নিদর্শন অবহেলায় ফেলে দেওয়ার ঘটনাও বিরল বা অসম্ভব নয়।

কিভাবে খননের কাজ করা হয়

খননের বহু পদ্ধতি আছে। কোন স্থানে বিস্তীর্ণভাবে খননের কাজ চালানোর আগে প্রত্নতাত্ত্বিক এগুলির কোন্‌টি সাফল্যজনক হবে সেটি বিচার করে দেখবার চেষ্টা করেন। মাটির তলায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রাচীন নগর বা বসতির সন্ধান চালাতে গেলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে খননের কাজ চালিয়ে যেতে হয়।

আগেকার দিনের অনুসন্ধানকারীরা যে-কোন একটি স্থানে খনন করে একটি খাদ তৈরি করে দেখতেন, তলায় কিছু আশাপ্রদ



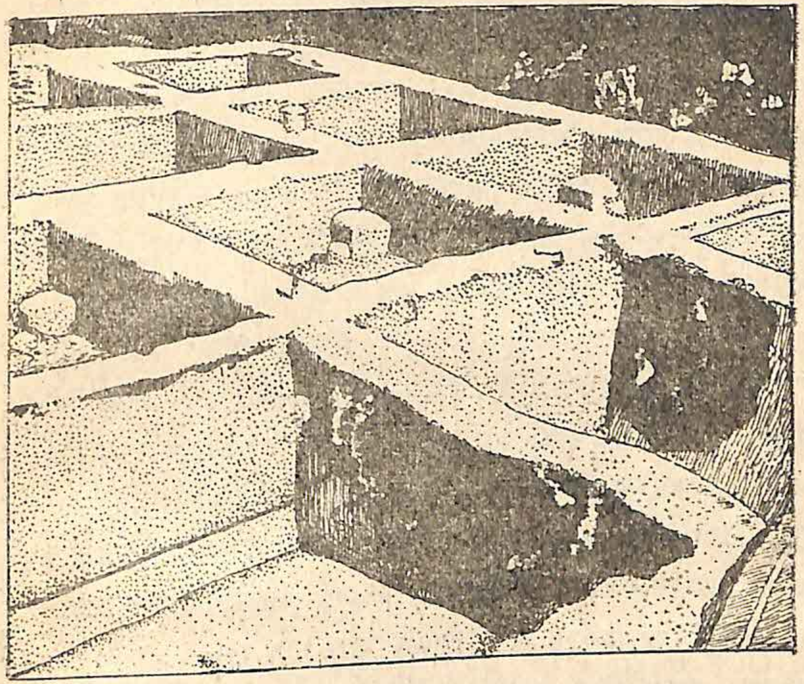
মাটির নিচে প্রাচীন দেয়ালের অবস্থিতি ও তার ফলে
কমজোরী উদ্ভিদের রেখা প্রত্নানুসন্ধানে সাহায্য করে

জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায় কি না। কিছু পেলে ভালই, না পেলে আবার অন্য জায়গায় আর-একটা গর্ত করা হত। এভাবে অনেক সময়ে অযথা পরিশ্রম করা হত এবং আংশিকভাবে খনন করেই কাজ শেষ করা হত। আধুনিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানীরা প্রত্ন-অঞ্চলকে কয়েকটি সমান মাপের চতুষ্কোণ বা আয়তাকার ক্ষেত্রে ভাগ করে পাশাপাশি এবং লম্বালম্বিভাবে নম্বর দিয়ে দেন। এরপর ক্রমে একটির পর একটি খাদ বা পরিখা খুঁড়ে সমগ্র অঞ্চলটিকে লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করে থাকেন।

প্রথমে জায়গাটিকে আয়তাকার ক্ষেত্রে ভাগ করা হলেও পরে অবশ্য প্রয়োজন-মত এইগুলির মাঝখানে প্রাচীরের উপযোগী এক হাত বা দেড় হাত পরিমাণ স্থান ছেড়ে দেওয়ার রীতি আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক তারপর আসল খননের কাজ শুরু করেন।

খননের কাজের সর্বজনগ্রাহ্য কয়েকটি নিয়ম আছে। প্রথমত, খাদগুলির চারদিক গোড়া থেকেই এমনভাবে খোঁড়া উচিত যাতে গর্তের বা পরিখার দেয়াল সোজাভাবে নিচে নেমে যায় ও চারপাশের কোণগুলি উপর থেকে নিচে অবিকৃত থাকতে

পারে। বেশ খানিকটা মাটি কাটার পর খাদের দেয়াল ভিতর দিকে ঢুকে গেলে সেটা বিপদজনকভাবে ধ্বসে পড়ার মত হয়ে ওঠে। খাদের দেয়ালের গা থেকে সুন্দর মৃৎপাত্র বা অন্য কোন



প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-স্থলের খাদ-বিন্যাস

ধরনের জিনিস ছাড়িয়ে নেবার লোভও সংবরণ করতে হয়। মাটির তলায় বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকাস্তর দেখতে পাওয়া যায়। এর কোনটাতে ইটের পরিমাণ বেশি, পলিমাটির চাপ-বাঁধা রূপ কোনটার, কোনটাতে বা একটি বিশেষ ধরনের মৃৎপাত্রের টুকরো বেশি পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্নতাত্ত্বিক ধীরে ধীরে একটির পর একটি স্তর কেটে যাবেন ও পারতপক্ষে একসঙ্গে একাধিক স্তরের খননের দায়িত্ব নেবেন না। কোন একটি স্তর সম্পূর্ণভাবে কাটা হয়ে গেলে খাদের চারদিকের দেয়ালে ছুরি

দিয়ে স্পষ্ট দাগ কেটে স্তর কোথায় আরম্ভ, কোথায় বা শেষ তা ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। এইরকমভাবে বেশ কয়েকটি স্তর পার হবার পর প্রত্নতাত্ত্বিক সবচেয়ে নিচে মনুষ্যবাসের নিদর্শনহীন মাটির স্তরে গিয়েই তবে খননে ক্ষান্ত দেবেন। এর আগে ইচ্ছেমত খননের কাজ বন্ধ করে দিলে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক অংশই অনাবিষ্কৃত থেকে যেতে পারে। মাটি কাটবার সময়ে ছোট হাতিয়ারের সাহায্যে ডেলাগুলিকে ভেঙে খুঁটিয়ে ভাল করে দেখাই উচিত। অনেকে বিভিন্ন আকারের চালুনি দিয়ে মাটির মধ্য থেকে প্রাচীন দিনের পুঁতি, টুকরো হাড় প্রভৃতি জিনিস অনুসন্ধান করেন।

খননের কাজে কোন্ জিনিসটি ঠিক কোথায় আছে এই সংবাদটি অত্যন্ত জরুরি। এই বিষয়ে নথিপত্র ভালভাবে তৈরি রাখবার জন্যে কয়েকটি পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। এইজন্যে খাদের চারদিকে সমান দূরত্বে কয়েকটি ছোট খুঁটি পুতে রাখা হয়। খুঁটির উপরে পেরেকের গায়ে জড়ানো সুতো থাকে। মনে করা যাক, খাদের মধ্যে একটি প্রত্নবস্তু পাওয়া গেল। এর সঠিক স্থান-নির্ণয়ের জন্যে তিনটি মাপ প্রয়োজন। প্রথম মাপ খাদের পাশে ঠিক আগের খুঁটি থেকে জিনিসটি যে রেখায় আছে তার দূরত্বের মাপ। দ্বিতীয় মাপ খুঁটির উপর দিয়ে যে সুতো গেছে সেখান থেকে জিনিসটির ঠিক উপর পর্যন্ত খাদের ভিতরের অংশের মাপ। এই দ্বিতীয় মাপটি প্রথম মাপের রেখা থেকে সমকোণে থাকবে। তৃতীয় মাপ হল উপর থেকে নিচে দ্বিতীয় মাপের শেষ বিন্দু থেকে তলাকার প্রত্নবস্তুর দূরত্বের মাপ। এই মাপ-কয়টি একসঙ্গে প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে 'ত্রৈমাত্রিক পরিমাপ' রূপে পরিচিত। প্রথম মাপের জন্যে একটি ত্রিকোণী ও লেভেল দরকার। দ্বিতীয় মাপেও এই দুটি যন্ত্র কাজে লাগবে। তৃতীয় মাপের জন্যে একটি জরিপের কাজে ব্যবহৃত খুঁটি অথবা

ওলনের দরকার হতে পারে। এ-ছাড়া প্রত্নবস্তুর নামের পাশে কোন্ অঞ্চলের কোন্ পরিখা থেকে কত স্তরে সেটি পাওয়া গেছে তার উল্লেখও করা উচিত।

খননের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বিভিন্ন পরিখার স্তর-বিন্যাসের চিত্রও তৈরি করাতে থাকেন। এ কাজে সাধারণ গ্রাফ কাগজই ব্যবহার করা চলে। বালিমাটি, পলিমাটি, নুড়িপাথর, চাপ-বাঁধা মাটি, ইটের টুকরো প্রভৃতি বোঝাবার জন্যে নক্সাতে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের প্রতীক-চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এ ব্যাপারে খুবই সাবধানে কাজ করা উচিত, কারণ এর অন্যথা হলে সামগ্রিক বিবরণ লেখবার সময়ে প্রচুর ভুল থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা।

একে-একে খাদগুলি খোঁড়া হয়ে যাবার পর বিভিন্ন খাদের মধ্যবর্তী দেয়ালগুলিকে স্তরে স্তরে খুঁড়ে ফেলে তবেই প্রত্নতাত্ত্বিক একটা সমগ্র চিত্র উপস্থাপিত করতে সমর্থ হন। মাঝের দেয়ালগুলি সরে যাবার পর একই গৃহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অথবা একই বসতির একাধিক অঞ্চলের মধ্যে একটা সম-সাময়িকতার চিহ্ন ধরা পড়ে।

সমাধিস্থল খোঁড়ার জন্যে আধুনিক খননকারীরা একাধিক পদ্ধতির ব্যবহার করেন। একটি বৃত্তাকার ঢিলাকে সাধারণত চারটি সমান ভাগে বিভক্ত করা হয়। তারপর এক একটি ভাগ খুঁড়ে বার করা হয়। এর ফলে স্তরবিন্যাসের ধারাটি খুবই সুবিধে-জনক ও নিখুঁতভাবে বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠে। কখনো-কখনো সমাধির ঢিলাকে কতগুলি সমান্তরাল অংশে ভাগ করে একে-একে খুঁড়ে দেখা হয়। এই পদ্ধতিটিও মন্দ নয়।

আলোক-চিত্রও এ কাজে খুব সাহায্য করে

খননকার্য পরিচালনার সময়ে মাঝে মাঝে আলোক-চিত্র গ্রহণের

প্রয়োজন হয়। খাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় কোন জিনিসের ছবি নেওয়ার আগে সেটিকে খুব সাবধানে পরিষ্কার করে তবেই ছবির বন্দোবস্ত করা উচিত। উপর থেকে ভালভাবে ছবি তোলার জন্যে উপরে দাঁড়াবার মত সিঁড়ির ব্যবস্থা রাখা দরকার। ছবির পাশে একটি নিখুঁত মাপের দাগ-কাটা স্কেল বা খুঁটি অথবা (ছবির বিষয় খুব বড় হলে) মানুষ দাঁড় করিয়ে তবেই ছবি তুলতে হয়। এর ফলে ছবির বিষয়ের আয়তন সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা হয়ে ওঠে। স্তর-বিন্যাসের ছবি তুলতে হলে খাদের দেয়াল সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে তবেই ছবি তোলা উচিত।

খননের কাজের সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের জিনিস মাটির তলা থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। কয়েক ধরনের জিনিস, যেমন—ভিজে কাঠ, কাঁচা মাটির তৈরি জিনিসপত্র, বহুদিনের পুরোনো হাড়গোড় প্রভৃতি অতি সহজেই বাতাস লেগে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এইজন্যে প্রত্ন-অভিযাত্রী দলের সঙ্গে কয়েকটি প্রধান প্রধান রাসায়নিক দ্রব্য-সমেত একটি ছোট পরীক্ষাগার থাকা অত্যন্ত জরুরি। সময়ে-সময়ে অতি ভঙ্গুর, মরচে-পড়া ধাতব দ্রব্য, অথবা মুদ্রাকেও বিশেষভাবে রক্ষা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মাটির তৈরি অথচ পোড়ানো হয় নি এ ধরনের মুদ্রাঙ্ক ব্যবহারের পূর্বে অল্প আঁচে সেঁকে নেওয়া যেতে পারে।

খনন-কার্য শেষ হওয়ার পর যত শীঘ্র সম্ভব একটি পরিপূর্ণ ও চিত্রিত বিবরণ প্রকাশ করা কর্তব্য। সুষ্ঠু প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণে প্রত্ন-অঞ্চলের মানচিত্র, যথেষ্ঠ পরিমাণে স্তর-বিন্যাসের চিত্র, আলোক-চিত্র ও প্রত্নবস্তুর রেখা-চিত্র থাকা দরকার। প্রত্ন-বিবরণ লেখার কাজে সরল ভাষা একটি প্রয়োজনীয় গুণ বলেই মনে করা হয়।

৮

ভারতে পুরাতত্ত্বের অনুশীলন

ভারতের মত বিরাট, সুন্দর ও মহান দেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি একদিনের চেষ্টায় গড়ে ওঠেনি। এ-জন্যে বহু যুগের প্রয়াস চলেছে। বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে এখানকার মানুষকে প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে। ক্রমে অভিজ্ঞতার সম্পদ বেড়ে উঠেছে। জেগে উঠেছে নিত্য নতুন শিল্পরীতি। গড়ে উঠেছে এক মহৎ সভ্যতা। বহু বিদেশী আক্রমণের অত্যাচার, প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলা এবং যুদ্ধের তাণ্ডব পার হয়ে আসতে হয়েছে এ-দেশের অধিবাসীদের। প্রাচীন সভ্যতার কত দর্শনীয় নিদর্শন ধুলো ও বন্যার পলিমাটিতে চাপা পড়ে গেছে, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, লতাগুল্মে ঢাকা পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে, তার কে হিসেব রাখে! কালক্রমে দেশবাসী পূর্ব-গৌরবের কথা বিস্মৃত হয়েছেন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পণ্ডিতেরা বলেছেন, ভারতের পূর্ব-ইতিহাস উল্লেখযোগ্য নয়। দেশের মানুষ এর মধ্যেও কিন্তু তাঁদের লোক-কথা, পুরাণ ও কাব্য-কাহিনী এবং নিজস্ব জীবনধারা দিয়ে সমস্ত অবজ্ঞাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। এইরকম একটা অবস্থায় পুরাতত্ত্ব বা প্রত্নতত্ত্বের চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা জানবার একটা আগ্রহ দেখা যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এই সময়টি হল অনুসন্ধিৎসার। সব কিছু জানবার ও বুঝে দেখবার এই মহৎ প্রয়াস ভারতে-আসা উদারমতি বিদেশীরা দেখিয়েছেন। দেশাভিমানে উদ্দীপ্ত দেশীয় পণ্ডিতদের প্রচেষ্টা এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে

কালক্রমে। তবে বাধা এসেছে বার বার। তবুও ধীরে ধীরে ভারতের সুমহান অতীত স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি

১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়াম জোন্স নামক এক ইংরেজ পণ্ডিতের ঐকান্তিক কর্মোদ্যমে কলকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপিত হয়। এ সংস্থার কাজ হল প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া। বহু-ভাষাবিদ্ পণ্ডিত জোন্স সংস্কৃত, প্রাচীন পারসীক, গ্রীক, লাতিন ও সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন নানা ভারতীয় ভাষার মধ্যে একটা ঐক্য ও সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। প্রাচীন গ্রীক বিবরণ থেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে চিনে নেওয়ার ক্ষমতা ও পাটলিপুত্রের অবস্থান নির্ণয়ও জোন্সের অন্যতম কৃতিত্ব। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। এই সময়ে জোন্সের সহযোগী চার্লস্ উইলকিন্স গুপ্ত-যুগের লিপি পাঠে সমর্থ হন। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের প্রারম্ভে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে বুকানন হ্যামিলটন নামক এক বিদেশী অনুসন্ধানকারী মহীশূরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, উত্তর-বঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের পূর্বদিকে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে সুন্দর বিবরণ তৈরি করেন। ঠিক এই সময়ের মধ্যেই পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন গুহার স্থাপত্যকলা পুনরায় আবিষ্কৃত হয়। বিশেষ করে এরস্কিনের বিবৃত অজন্তার চিত্র-সম্ভারের অভূতপূর্ব সৌন্দর্যে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়।

এর পরবর্তী যুগে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের ক্ষেত্রে জেম্স্ প্রিন্সেপ ও অ্যালেকজাণ্ডার কানিংহ্যাম নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। জেম্স্ প্রিন্সেপ কলকাতা টাঁকশালের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকের কাজও তিনিই করতেন। লিপিতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্ব প্রিন্সেপের প্রিয় বিষয় ছিল। বহু বছর গবেষণার শেষে প্রিন্সেপ প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার

করতে সমর্থ হন। এইভাবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত খরোষ্ঠী লিপির আবিষ্কার-প্রচেষ্টাও সফলতা লাভ করে। মৌর্য সম্রাট অশোকের শিলালেখের পঠন-পাঠনের ফলে ভারতের ইতিহাসের চর্চা অনেকটা এগিয়ে যায়। পরবর্তীকালের বিভিন্ন লিপির (যেগুলো ব্রাহ্মী থেকে



জেম্স্ প্রিন্সেপ (প্রস্তরের আবক্ষ প্রতিমূর্তি হইতে)

উৎপন্ন হয়েছিল) পাঠোদ্ধার সহজসাধ্য হয়ে পড়ে। অ্যালেকজাণ্ডার কানিংহ্যাম ছিলেন সামরিক বিভাগের এক এঞ্জিনীয়ার। প্রিন্সেপের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হন। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কানিংহ্যাম প্রাচীন ভারতীয় সৌধাবলীর সংরক্ষণের জন্যে সরকারি ব্যয়ে একজন অভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে দেন। অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের কাজেও তিনি এই সময়ে নিশ্চেষ্ট থাকেন নি। জেম্স্ ফার্গুসন নামে আর একজন অক্লান্তকর্মী পণ্ডিত বহু বছরের চেষ্টার পর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যেই ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রাচীন

স্থাপত্যকীর্তিগুলিকে শ্রেণীবিন্যস্ত করতে সমর্থ হন। এইসময়কার অন্যান্য পণ্ডিতদের মধ্যে পশ্চিম-ভারতীয় লিপি-বিশারদ ভাউদাজী এবং দক্ষিণের মহাপ্রস্তরীয় সমাধি আবিষ্কারের জন্য মেডোজ টেলরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের ব্রিটিশ শাসকরা বুঝতে পারেন যে, দেশের সবরকম খবর ভালভাবে সংগ্রহ করতে না পারলে শাসন-কার্য চালানো অসম্ভব। ব্রিটিশ শাসনের একটি কল্যাণধর্মী চিত্র রাখার প্রয়াসও বোধহয় এর পেছনে ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে কানিংহামকে ভারতীয়



আলেক্‌জাণ্ডার কানিংহাম

প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের কর্মকর্তার পদে নিয়োগ করা হয়। কানিংহাম উত্তর ও মধ্য-ভারতের বহু প্রাচীন স্থান পর্যটন করেন। প্রাচীন ভারতের নগর ও জনপদের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টাও তিনি করেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে বিদেশী শাসকেরা চার বছর পর এই সংস্থাটি বিলোপ করে দেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থাটি বিলুপ্ত হলেও ভারতের প্রত্নতত্ত্বের কাজ বন্ধ থাকে নি। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের মধ্যে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কর্মচারী রবার্ট ব্রুস ফুট ও অন্যান্য পণ্ডিতদের চেষ্টায় দক্ষিণ-পশ্চিম ও মধ্য-ভারত এবং উত্তর প্রদেশ থেকে প্রাচীন ও নব্য-প্রস্তর যুগের পাথরে তৈরি অস্ত্র পাওয়া যায়।

ফার্গুসন-প্রমুখ পণ্ডিতদের চেষ্টায় অবশ্য কয়েক বছর পরই আবার প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগটি চালু করা হয়। কার্লাইল, গ্যারিক, জেম্‌স্‌ বার্গেস প্রভৃতি পণ্ডিতেরা প্রত্ন-অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। তবে, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে কানিংহ্যামের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নানাভাবে এ বিভাগের উন্নতি করে গেছেন। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে কানিংহ্যাম কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে এর পরে জেম্‌স্‌ বার্গেসের পরিচালনার যুগ শুরু হয়। বহু স্থাপত্য-নিদর্শনের বিবরণ সংগ্রহ করে বার্গেস ও তাঁর সহকর্মীরা ত্রিশ খণ্ডের অধিক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি-বিষয়ক পত্রিকা এবং কেবলমাত্র শিলালেখের জন্যে 'এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা' নামক গ্রন্থের ধারাবাহিক প্রকাশও এই প্রত্নতত্ত্ববিদের অন্যতম কীর্তি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে ভগবানলাল ইন্দ্রজী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ফ্লীট, ব্লকম্যান প্রভৃতি পণ্ডিতদের নামও উল্লেখ করবার মত। তা ছাড়া জার্মান পণ্ডিত বুহ্‌লার-এর ভারতীয় লিপিতত্ত্ব বিষয়ে বিখ্যাত বইটিরও নাম করতে হয়।

১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে বার্গেসের অবসর গ্রহণের পর প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে আবার অরাজকতার সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় শাসকচক্র প্রাদেশিক সরকারের উপর প্রত্নবস্তু পর্যবেক্ষণের ভার দেওয়াতে গবেষণার কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। প্রত্নতত্ত্বের কাজে কোন দূরদর্শী পরিকল্পনারও অভাব দেখা যায় এ সময়।

এইরকমভাবে বহুদিন চলার পর ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতীয় প্রত্নচর্চার জন্যে সরকারী সাহায্যের ও সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রয়োজন সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দান করেন। এরপর সরকারী সাহায্যে নামজাদা প্রত্নতাত্ত্বিক জন মার্শাল ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার ভার গ্রহণ করেন। এর কয়েক বছর বাদেই প্রত্নকীর্তি সংরক্ষণ আইন বিধিবদ্ধ হয়। মার্শাল প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগটিকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলেন। বিংশ শতকের প্রথম কুড়ি বছরের মধ্যেই উত্তর-ভারত, মধ্য-ভারত ও তদানীন্তন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মার্শাল ও তাঁর সহকর্মীরা প্রাচীন ভারতীয় নগরগুলির পরিচয় আবিষ্কার করেন। এ-গুলির মধ্যে সারনাথ, ভীটা, বৈশালী, পাটলিপুত্র, নালন্দা, তক্ষশিলা এবং পেশওয়ারের খননকার্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এইসকল স্থানে খননের ফলে মৌর্যযুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত সময়ের বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রখ্যাত অভিযাত্রী মার্ক অরেল স্টাইন মধ্য-এশিয়া, কাশ্মীর ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধানের কাজ চালান। এর ফলে বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার ও সংযোগ সম্পর্কে বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের নতুন যুগ

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক দয়ারাম সাহনি এবং ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে পশ্চিম পাঞ্জাবের হরপ্পা ও সিন্ধুপ্রদেশের মহেন-জো-দাড়োতে এক নতুন ধরনের নাগরিক সংস্কৃতির আবিষ্কার করেন। এই দুই অঞ্চলে খনন-কার্যের জন্যে পণ্ডিত মাধো স্বরূপ ভাট্স্, কে. এন. দীক্ষিত, মার্শাল, ম্যাকে, হারগ্রীভ্‌স্ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ভারতের বুকে খ্রীস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগেকার এক বিরাট ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির পরিচয় পান। এ ব্যাপারে ননীগোপাল মজুমদার ও অরেল স্টাইনের বালুচিস্তান অঞ্চলে অনুসন্ধানের ফলও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

এই সময়ের প্রত্নতত্ত্বচর্চা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, অধ্যাপক ভাণ্ডারকর প্রভৃতি মনীষীর অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত পাহাড়পুর বা প্রাচীন সোমপুর বিহারের ও মহাস্থানগড়ের আবিষ্কার ও অন্ধ্রদেশের নাগার্জুনকোণ্ডার বৌদ্ধকীর্তির ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কারও এই সময়েই হয়েছিল।

এরপর কাশ্মীর থেকে পাওয়া তুষার-যুগের পাথুরে অস্ত্র, দিনাজপুরের বাণগড়ের প্রাচীন সৌধাবলী, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের নানা আবিষ্কার এ প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পারা যায় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ইংল্যাণ্ডের এক নাম-করা প্রত্নতাত্ত্বিক লিওনার্ড উলী এ-দেশে আসেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে-সব অভিমত প্রকাশ করেন তা নানা দিক দিয়েই মূল্যবান। এ সময়ে গুজরাট থেকে পুরা-প্রস্তর যুগের নানা অস্ত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। প্রাচীন পাঞ্চাল রাজ্যের রাজধানী অহিচ্ছত্রনগরের উল্লেখ আছে মহাভারতে। উত্তর প্রদেশের বেরিলি জেলায় এ জায়গাটি অবস্থিত। এখানে খননকার্য চালিয়ে ভারতের প্রাচীন কালের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা গেছে।

১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তক্ষশিলা, পণ্ডিচেরি, হরপ্পার সমাধিক্ষেত্র, মহেন-জো-দাড়োর দুর্গপ্রাকার, মহীশূরের ব্রহ্মগিরি প্রভৃতি জায়গায়ও খননকার্য চালানো হয়েছিল। এর ফলে নানা ধরনের নতুন তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। এ সময় ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার কর্ণধার ছিলেন মর্টিমার হুইলার নামে একজন নাম-করা প্রত্নতাত্ত্বিক। হুইলারের প্রতিটি খনন-কার্যের বিবরণ বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে প্রকাশিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খনন-কার্য করাই হুইলারের ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

ভারতে আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব

বর্তমানে ভারতে প্রত্ন-আবিষ্কার ও খননকার্যের ক্ষেত্রে আগেকার বহু অজানা বিষয়ই ক্রমশ পরিষ্কার ও বোধগম্য হয়ে আসছে।

কাশ্মীর, পাঞ্জাব, মধ্য-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের পুরা-প্রস্তর যুগের অস্ত্র-সম্ভারের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলা ও অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চল এবং উড়িষ্যা থেকেও এই সময়ের নিদর্শন পাওয়া গেছে। নব্য-প্রস্তর যুগের নিদর্শনের সন্ধান এসেছে

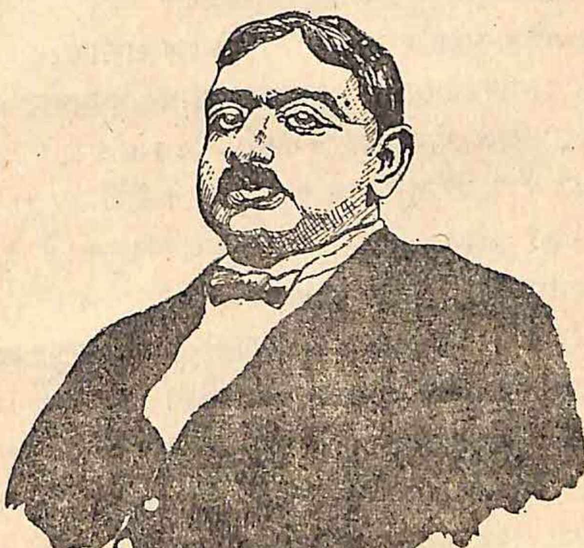


স্যর জন মার্শাল

কাশ্মীরের বুরজাহোম, অন্ধ্র, মহীশূর এবং উড়িষ্যা থেকেও। গুজরাটের রংপুর ও লোথালে, রাজস্থানের গঙ্গানগর জেলার বিভিন্ন অংশে, পূর্ব-পাঞ্জাবের রূপড়ে এবং মীরাট জেলার আলমগীরপুরে সিন্ধু-সভ্যতার

বহু ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম নগর-সভ্যতাগুলির মধ্যে ভারতের সিন্ধু-সভ্যতার স্থান সবচেয়ে উপরে। সিন্ধুপ্রদেশ, সমগ্র পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ জুড়ে ছিল এই সভ্যতা। লোথালের বৃহৎ বন্দর ও পোতাশ্রয় প্রমাণ করেছে যে, সিন্ধুবাসীরা পোতাশ্রয় নির্মাণে এবং সমুদ্রযাত্রায় অপটু ছিল না।

ভারতে একই সময়ে একই ধরনের সংস্কৃতি সব অঞ্চলে ছিল না। সিন্ধু-সভ্যতার যুগের শেষার্ধ থেকে খ্রীস্টপূর্ব এক হাজার বছর সময়ের মধ্যের বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক তাম্র-প্রস্তরীয় বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে



রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজস্থানে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে, মধ্যভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে অজয় নদীর উপত্যকায় প্রাচীনতম সংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ। পূর্বভারতের প্রত্নতত্ত্বে এটি একটি বিশেষ সম্ভাবনাময় দিকের সন্ধান দেয়।

সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার অন্তিম কাল থেকে মৌর্য যুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে অন্ধকার যুগ বলে পরিচিত। সাম্প্রতিক কালে পূর্ব-পাঞ্জাবের রূপড় নামক স্থানে, দিল্লীর ইন্দ্রপ্রস্থে, যুক্তপ্রদেশের অহিচ্ছত্রে ধূসর বর্ণের যে চিত্রিত মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে সেগুলি খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে একাদশ শতাব্দী কালের বলে মনে করা হয়। উত্তর প্রদেশের মীরাট জেলার যমুনা নদীর তীরের হস্তিনাপুর গ্রামে এই ধরনের মৃৎপাত্রের অবস্থান বিশেষ কৌতূহলজনক।

এরপর পাটনা বা পাটলিপুত্রের খননের কথা ও প্রাচীন বৈশালী বা বর্তমান মজঃফরপুর জেলার বসাঢ়ে নগর-কীর্তির ও স্তূপের খননকার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিহারের কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল গবেষণা প্রতিষ্ঠান এই খনন-কাজ করেন। উড়িষ্যায় প্রাচীন তোসলী অথবা কলিঙ্গনগরে বা বর্তমানের শিশুপালগড়ে ব্যাপক খননকার্য এবং কটক জেলার রত্নগিরিতে বৌদ্ধ বিহারের সন্ধান লাভও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করার মত। এর ফলে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী কালের মধ্যে উড়িষ্যার শিল্পকলা ও সভ্যতার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বর্ধমান জেলার বীরভানপুরে প্রাগৈতিহাসিক পাথরের ক্ষুদ্রাস্ত্রের সন্ধান লাভ ও পাণ্ডুরাজার ঢিবির কথা আগেই বলা হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মের উদ্যোগে চব্বিশ পরগণা জেলার চন্দ্রকেতুগড়ে ঐতিহাসিক কালের গুরুত্বপূর্ণ খননের কাজ চলে আসছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগের বড়-বড় মন্দির, সুউচ্চ নগর-প্রাকার, সুন্দর পোড়ামাটির শিল্পকলা এই প্রত্নস্থলের অন্যতম গৌরব। এর আগেই মেদিনীপুর জেলার ইতিহাস-বিখ্যাত আন্তর্জাতিক বন্দর তাম্রলিপ্তে অনুসন্ধানমূলক খননকার্য চলেছিল ভারতীয় প্রত্ন-সমীক্ষার উদ্যোগে। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি স্থানে খনন করে গুপ্ত ও তার পরবর্তী যুগের ঘরবাড়ি, ভাস্কর্য, স্থাপত্যকলা ও প্রাচীন কালের বিখ্যাত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের নাম উল্লিখিত মুদ্রাঙ্ক পাওয়া গেছে।

প্রাচীন কালের কৌশাম্বী নগরের মহাপ্রাকার ও কাশীর রাজঘাটের প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার করাও সম্ভব হয়েছে কিছুকাল আগে। গুজরাট থেকে পশ্চিম ভারতীয় ক্ষত্রপ নৃপতিদের রাজত্বকালের সুন্দর কারুকার্যময় বৌদ্ধ স্তূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাছাড়া অন্ধ্রের গুন্টুর জেলায় নাগার্জুনকোণ্ডাতে প্রাগৈতিহাসিক পাথুরে অস্ত্রশস্ত্র ও ঐতিহাসিক যুগের বিরাট রঙ্গভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে।

দেশ স্বাধীন হবার পর প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্থাপিত হয়। এ-সব সংস্থা ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে অনুসন্ধান-কার্য চালিয়েছেন তাও নানা দিক দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত।

আমাদের দেশে বর্তমানকালে প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে নতুন করে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সন্ধান পাওয়া যায়। কলকাতা, পাটনা, এলাহাবাদ, বারাণসী, বরোদা, পুনা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। তা-ছাড়া তরুণ কর্মীদের প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা কিভাবে চালাতে হয়, কিভাবে খননকার্য করতে হয় এবং আরও বহু বিষয়ে হাতে কলমে শিখিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষার দিল্লীর বিদ্যালয়ে।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের প্রত্নতত্ত্ববিদরা ভারতের বাইরে নানা জায়গায়ও অনুসন্ধান-কাজ চালিয়েছেন। ইন্দোনেশিয়ার বোরোবুদুর, আফগানিস্তান, নেপাল, মিশরের নুবিয়াতে এঁরা উল্লেখ করবার মত কাজ করেছেন।

কয়েক বছর আগে দিল্লীতে একটি আন্তর্জাতিক প্রত্নতত্ত্ব-সম্মেলন বসেছিল। এখানে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বহু জ্ঞানী ও গুণীর সমাবেশ হয়েছিল। উপলক্ষ ছিল ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষার একশো বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব।

প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা

প্রত্নতত্ত্বের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নানা জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক

সংগ্রহশালা বা জাদুঘর স্থাপনের সূচনা হয়েছিল। বর্তমানে আমাদের দেশের প্রতিটি বড় শহরেই এ ধরনের সংগ্রহশালা দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম তো তোমাদের অনেকেরই দেখা। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির নানা নিদর্শন দিয়েই ভারতীয় জাদুঘরের সৃষ্টি। পরে অবশ্য নানাভাবে এর কলেবর বেড়েছে। দিল্লীতেও জাতীয় সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে ভালভাবে বুঝতে হলে এ দুটি ছাড়া বোম্বাইয়ের প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ সংগ্রহশালা, লক্ষ্ণৌ ও মথুরার সংগ্রহশালা, নাগপুর, জয়পুর, বরোদা, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, ত্রিবান্দ্রম, হায়দারাবাদ প্রভৃতি জায়গার নাম-করা সংগ্রহশালা দেখা দরকার। বাংলাদেশের প্রাচীন নিদর্শন দেখতে হলে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংগ্রহ-শালাটি দেখতে পার। প্রাচীন মঠ, মন্দির ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে হলে নালন্দা, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, খাজুরাহো, সাঁচী, নাগার্জুনকোণ্ডা প্রভৃতি জায়গার স্থানীয় সংগ্রহশালাগুলি ঘুরে আসা যেতে পারে।

আমাদের বিস্মৃত অতীতকে বুঝতে হবে অতীতের নানা নিদর্শন দিয়েই। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, পুরাতত্ত্বের চর্চা মানে ইট-কাঠ-পাথরের চর্চা নয়। পুরোনো কালের কোন পাথরের মূর্তি বা খোদাই-করা ইট বা এক টুকরো কাঠের ব্যবহার করেছে তো মানুষই। কাজেই নিদর্শনগুলিকে অতিক্রম করে সে-সবের পেছনকার মানুষ-গুলিকে খুঁজে বার করতে হবে। বুঝতে হবে তাদের ভাষা, তাদের সভ্যতা, তাদের সংস্কৃতি। তবেই না মানুষ হিসেবে বহু যুগ আগেকার সে-সব মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সাধনা সফল হবে, সার্থক হবে প্রত্নতত্ত্ব বা পুরাতত্ত্বের চর্চা।

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta

R

বিজ্ঞানসাধকের অতন্দ্র সাধনা, তাঁদের
সত্যসন্ধিৎসা যেমন অনবচ্ছিন্ন, মহাবিশ্বের
দিকে দিকে তাঁদের নিত্য নতুন
অভিযান তেমনি রোমাঞ্চকর, তেমনি
চমকপ্রদ। কুঞ্জবিহারী পাল-সম্পাদিত
এই গ্রন্থে বিজ্ঞানের
সেই সব অভিযানের বিস্ময়াবহ
কাহিনী, আবিষ্কারের কৌতূহলে-ভরা
কথা তুলে ধরা হয়েছে
অতি সহজ সরলভাবে। বিষয়ের
বর্ণনায়, ভাষার সুকুমার
উপস্থাপনে এবং ব্যাপ্তিশীল
রস-রীতির পরিচয়ে এ-গ্রন্থ এক
উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকার্য। কিশোর পাঠকদের
কাছে এ এক আদরনীয় সম্পদ।